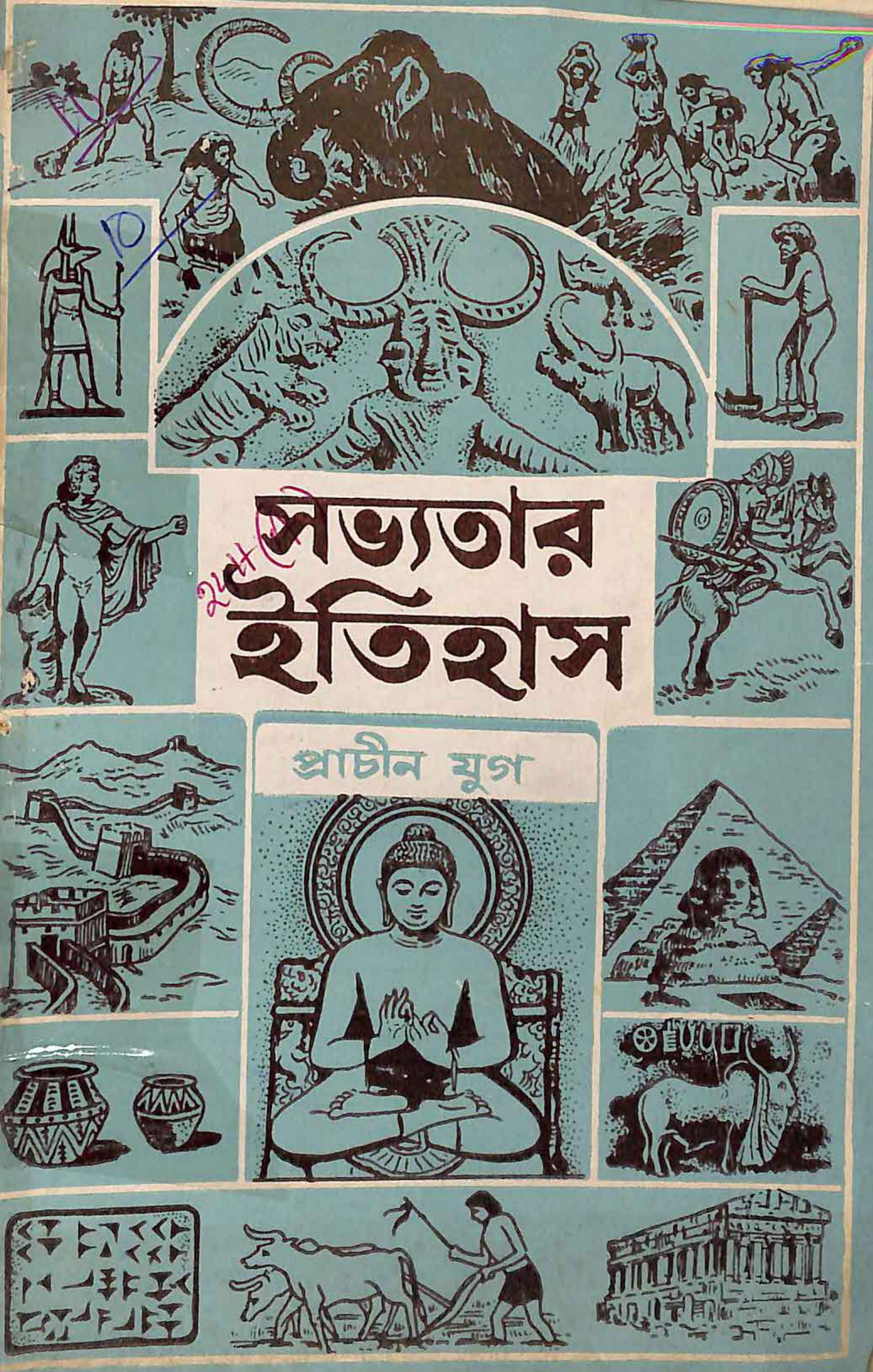
সভ্যতার ইতিহাস

প্রাচীন যুগ



Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text-book of History for Class VI.
Vide Notification T. B. No. VI/H/79/13, dated 5. 1. 79

সভ্যতার ইতিহাস

(প্রাচীন যুগ)

[ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য]

অরবিন্দ ঘোষ, এম. এ. (ডবল) বি. টি.
(ইতিহাস এবং প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি) ;
শিক্ষক—শ্যামনগর কান্তিচন্দ্র উচ্চ (উচ্চতর)
বিদ্যালয়, শ্যামনগর, ২৪-পরগনা।
ভূতপূর্ব শিক্ষক—সিঁথি শিক্ষায়তন ও সিঁথি রামকৃষ্ণ
সংঘ বিদ্যামন্দির, কলিকাতা-৫০

ও

শ্রীপ্রতাপ শঙ্কর লাহিড়ী
অধ্যাপক—শম্ভুনাথ কলেজ, লাভপুর, বীরভূম

চক্রবর্তী পাবলিশার্স
৩০/১বি, কলেজ রো,
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক ঃ
টি. কে. চক্রবর্তী
চক্রবর্তী পাবলিশার্স
৩০/১বি কলেজ রো,
কলিকাতা—৭০০ ০০৯

প্রথম মুদ্রন—জানুয়ারী, ১৯৮০ সাল
দ্বিতীয় মুদ্রন—এপ্রিল, ১৯৮২ সাল
সংশোধিত সংস্করণ—জানুয়ারী, ১৯৮৪ সাল

মূল্য—৭.৫০

[ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সুলভ মূল্যের কাগজে মুদ্রিত]

মুদ্রাকর ঃ
যশোদা মাইতি
৫২/১ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট,
কলিকাতা—৭০০ ০০৯

SYLLABUS IN HISTORY

CLASS—VI

Maximum 120 Pages (100 Pages of Contant matter and 20 Pages of Maps, illustrations, exercises etc,) Size Double Demy (1/16) and Pica Type.

HISTORY OF ANCIENT CIVILISATIONS

A. (i) Why we should read history ; (to be acquainted with human civilisation, its development).

(ii) How we come to know of ancient people.

B. EARLY MAN.

Use of fire as early as 300,000 B. C (by 'Peking Man') ; Food gathering man.

OLD STONE AGE :

Nature of tools and implements, their uses.

NEW STONE AGE : (By 8000 B. C.)

Evolution of tools and implements.

Man a food producer.

THE NEO-LITHIC REVOLUTION : concisted also of domestication of animals : Invention of pottery (wheel) ; weaving (clothings) ; dwelling stone houses with defences ; early transport beginnings of community life in settlements ; beliefs and arts (as evident from cave-paintings etc) ; use of formal language a means of communication ; worship of the Goddess of productivity.

C, COPPER BRONZE AGE :

Emergence of towns ; changes in production specialisation (various types of skill of artisans and craftsmen) ; commerce (exchange of commodities) ; some changes in social life classes ; intertribal conflicts ; amergence of an early form of state.

Reasons of the growth of River-Valley Civilisation.

D. THE EARLY CIVILISATIONS (3000 B. C. 1500 B. C.)

Mesopotamia. Egypt, Indus Valley, China in outlines :

(i) MESOPOTAMIA :

(a) Location and antiquity, earlier development of civililsation than in other areas.

(b) Fertility of the soil, crops. (c) Defence aganist floods.

(d) Other occupations.

(e) Achievements of Sumerians : imposing towers, mud-brick temples, fresco, stone-cutting, metallurgy, transport and trade, script.

(ii) EGYPT :

(a) Location and nature of the land ; (b) The Pharaoh, the priest, script and scribes, tax-collectors and 'soldiers' (workers) ; (c) Trade ; (d) The Pyramids (Examples) ; (e) Religious beliefs ; (f) Chief occupations.

(iii) THE INDUS VALLEY :

(a) The discoveries (brief reference to locations and findings) ;

(b) Town planning ; (c) Food and other articles of use, (d) Crafts ; (e) Trade ; (f) Worship ; (g) Light thrown by relics upon classification in society.

(iv) CHINA :

(a) Valley of Huang Ho and Yangste Kiang ;

(b) China in early times ;

(c) Myths (particularly of flood)

(v) Common features in brief, of the riparian civilisations, with special reference to social and economic life.

E. THE IRON AGE SOCIETIES :

(a) Discovery and use of iron, impact ;

(b) Main features of social and economic life ;

(c) Groweh of Kingship.

1. (i) BABYLON :

Farming and commerce. Temples and Priests ; Learning and cultures ; The code of Hamurabi—nature of society revealed by the Code.

(ii) EGYPT AS AN IMPERIAL POWER :

Colonies ; The power of priests

(iii) IRAN :

Rise of Persia, Zoroaster

(iv) THE JEWS :

Hebrews in Egypt ; Hebrews exedus under Moses flight from slavery.

II. GREECE (only in broad outlines):

An introductory note on the influence of Crete; The Homeric Age. The city state, cultural interchange, colonisation.

Athens and Sparta their social and political life. Athens Vs. Sparta.

Cultural greatness of Athens: Literature, Arts, Religion, brief reference to a few eminent persons e. g. Pericles, Socretes. Herodotus, Sophocles.

Macedon: Alexander his invasion of India. Fall of the Empire. Roman conquest of Greece.

III. ROME:

Origin of Rome Conflict with Carthage. Early Roman Society; patricians and Plebeians; Roman citizenship. Slavery and slave revoltes (Spartacus).

JULIUS CAESAR: End of Roman Republic. New Empire. Eventual decline and fall. Rise of Christianity.

IV. CHINA:

"Great Shang". Confucius his teachings, Building the Great Wall. The Chin Empire.

V. INDIA:

(a) The coming of the Aryans. (b) The Vedas (c) Early Aryan Society, religion, and political organisation (with reference to the Vedas). (d) The Epics. (e) The rise of Jainism and Buddhism, (f) The Empiresa brief outline of development from the Mauryas to the Kushans-to the decline of the Gupta Empire. (g) Ancient Bengal upto the decline of the guptas (on the basis of petroven historical materials viz inscription and literary evidence). (h) Foreign contacts (particularly with Central Asia) their impact upon society and trade; (i) Foreign Travellers-Megasthenes and Fa-Hien-general picture of society as revealed in their accounts (in brief outlines only). (j) A brief summary of ancient Indian developments in arts and architecture, literature, education (Texila and Nalanda). and Sciences (Astronomy, Mathematics, Chemistry, Medicine).

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় | ১। আমরা ইতিহাস কেন পড়ব

মানুষের সভ্যতার ক্রমিক বিকাশের বিবরণই হচ্ছে ইতিহাস। ইতিহাস পড়ে আমরা জানতে পারি অতীতের মানুষ কিভাবে প্রকৃতির নানা বিরুদ্ধ শক্তির সাথে লড়াই করে এই পৃথিবীকে মানুষের বাস-যোগ্য করে তুলেছিল, পৃথিবীর নানা স্থানে তারা গড়ে তুলেছিল কত সভ্যতার ইমারত। কালের আবর্তনে সে সভ্যতা বিকশিত হয়েছে; ইতিহাসের নির্দিষ্ট নিয়মে সে সভ্যতা ধ্বংসও হয়েছে। সেই ধ্বংসের উপর গড়ে উঠেছে আরও উন্নত আর এক নতুন সভ্যতা। এই প্রক্রিয়াই চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। ইতিহাসের গতির এই ধারা কখনই থেমে পড়েনি, সদা চলমান। ইতিহাস পড়ে আমরা বুঝব কি সেই ইতিহাসের নিয়ম কি সেই ধারা।

ইতিহাস পড়ে আমরা জানতে পারব, সভ্যতার এই ভাঙা গড়ায় মানুষের ভূমিকাই প্রধান। তাই মানুষের ক্ষমতা সম্পর্কে আমাদের শ্রদ্ধা যাবে বেড়ে। আমাদের মনে আসবে গভীর আত্মবিশ্বাস। আর সেই আত্মবিশ্বাসের জোরে আমরাও আমাদের প্রিয় দেশকে, আমাদের প্রিয় এই পৃথিবীকে আরও সুন্দর করে গড়ে তোলার চেষ্টা করব।

এই সব কারণেই আমরা ইতিহাস পড়ব, ইতিহাসের শিক্ষাকে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করব।

২। অতীতের কথা জানার উপায়

অতীতের মানুষ আজ নেই। কিন্তু তারা যে সব জায়গায় বসবাস করত সে সব জায়গায় তাদের অজান্তেই তারা অনেক স্মৃতিচিহ্ন

রেখে গেছে। অতীতের মানুষ কত শহর-নগর গড়েছে, গড়েছে কত ইমারত, সৌধ আর রাস্তা ঘাট। এ সব পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে থাকতে জরাজীর্ণ হয়ে এক সময় ধ্বংস হয়ে গেছে। তারপর কালে কালে সেগুলো ধূলো মাটির তলায় চাপা পড়ে গেছে। তার উপর ক্রমশ গজিয়ে উঠেছে গাছপালা আর বনানী। এরপর হাজার হাজার বছর পরের যুগের মানুষ মাটি খুঁড়তে গিয়ে আবিষ্কার করে ফেলেছে অতীত যুগের সেই সব ধ্বংসাবশেষ। সেই সব ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকেই বেরিয়ে পড়েছে অতীত মানুষের কত স্মৃতিচিহ্ন, তাদের ব্যবহার করা কত জিনিস। আমরা সেই সব নিদর্শন থেকে জানতে পারি অতীত মানুষের অনেক কথা—তারা মোটামুটি কেমন ছিল, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ কেমন ছিল, তারা কি খেয়ে জীবনধারণ করত, তাদের জীবিকা কি ছিল, তাদের ধর্ম বিশ্বাসই বা কি ছিল ইত্যাদি কত বিষয়। প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতা, মিশরীয় সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা, চীনের সভ্যতার কথা আমরা জানতে পেরেছি সেই সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে।

অতীত মানুষের ভাবনা চিন্তা আর তাদের মনের পরিচয়ও আমরা জানতে পারি তাদের আঁকা নানা রকম ছবি আর তাদের খোদাই করা নানা রকম মূর্ত্তি থেকে। এমনকি, লক্ষ লক্ষ বছর আগেকার আদিম মানুষ যারা পর্বতের গুহা-কন্দরে বাস করত, তাদের কথাও আমরা জানতে পেরেছি তাদের ব্যবহার করা নানা জিনিস থেকে, গুহার দেওয়ালে তাদেরই আঁকা নানা রকম ছবি থেকে। ফ্রান্সের এক গুহায়, স্পেনের আলতামিরা গুহায় আর চীনের পিকিং-এর কাছে এক গুহায় লক্ষ লক্ষ বৎসর আগেকার গুহাবাসী মানুষের অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে।

অতীত মানুষের কথা আমরা জানতে পারি আর একটা উপায় থেকে তা হল, অতীত মানুষের লিপি। আজ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে বিভিন্ন দেশের মানুষ লেখার জন্য নানা রকম লিপির ব্যবহার শিখেছিল। সেই লিপির সাহায্যে তারা

পাথরের গায়ে, মাটির ফলকে, গাছের বাকলে, আরও কত জায়গায় লিখে রেখে গেছে। পণ্ডিতরা অনেক চেষ্টা করে অতীত মানুষের ব্যবহার করা সেই সব লিপির পাঠোদ্ধার করেছেন। এখনও অনেক লিপির পাঠোদ্ধারের চেষ্টা চলছে। এই সব লিপির পাঠোদ্ধার হওয়ার ফলে আমরা অতীত সুমেরীয় সভ্যতা, মিশরীয় সভ্যতা ও চীনের সভ্যতার অনেক মূল্যবান কথা জানতে পেরেছি। আমাদের দেশে প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অনেক লিপির সন্ধান পাওয়া গেছে। সেগুলো পাঠোদ্ধার করা এখনও সম্ভব হয়নি। পণ্ডিতরা চেষ্টা করে চলেছেন। সিন্ধু লিপির পাঠোদ্ধার হলে আমরা আমাদের দেশের এই প্রাচীনতম সভ্যতা সম্বন্ধে আরও অনেক মূল্যবান তথ্য জানতে পারব।

অনুশীলনী

১। ইতিহাস কি ?
২। ইতিহাস পড়ে আমরা কি জানতে পারি ?
৩। ইতিহাস পড়লে আমাদের কি উপকার হবে ?
৪। কি কি উপায়ে আমরা অতীত মানুষের কথা জানতে পারি ?

দ্বিতীয় অধ্যায় | ১। আদিম মানুষ

আজ থেকে প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল। এরা পাহাড় পর্বতের গুহায় ছোট ছোট দল বেঁধে থাকত। গাছের ফল-মূল, কন্দ আর জন্তু-জানোয়ার শিকার করে খেত। এরা আগুন জ্বালতে জানত না। কাজেই কাঁচা মাংসই এরা খেত। এদের জীবন ছিল প্রায় পশুর সামিল। তবে অন্যান্য পশুর থেকে এদের একটু তফাৎ ছিল এই যে, অন্যান্য পশুর থেকে এরা ছিল অনেক বুদ্ধিমান আর এরা নিজেদের হাত দুটোকে প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারত। সেকালের ভীষণ ভীষণ হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের সাথে এদের লড়াই করে টিকে থাকতে হত। কাজেই এদের জীবন ছিল খুবই কষ্ট সাধ্য।

আদিম মানুষ আগুন জ্বালাতে শিখল ঃ আমাদের এই আদিম পূর্বপুরুষেরা আগুন জ্বালাতে না জানলেও আগুনের সাথে তাদের পরিচয় ছিল অনেক কাল আগে থেকেই। কিন্তু আগুনকে তারা ভীষণ ভয় করত। বজ্রপাতের ফলে বনে আগুন লাগলে, আগ্নেয়গিরির জ্বলন্ত লাভাস্রোত প্রবাহিত হলে, এমনকি আকাশে বিদ্যুৎ চমকালেও তারা ভয়ে পালাত আত্মরক্ষার জন্য। কিন্তু অনেককাল ধরে লক্ষ্য করার ফলে তারা আগুনের দুটি গুণের কথা জানতে পারল। প্রচণ্ড শীতে আগুনের উত্তাপ বেশ আরাম দায়ক, আর আগুনের পাশে বসে থাকলে শিকারসন্ধানী জন্তু-জানোয়ার কাছে আসতে ভয় পায়। তাই হয়তো একদিন তাদের কেউ খড়কুটোর মশাল জ্বেলে আগুনকে নিয়ে এল তাদের গুহায়। কাঠ, শুকনো লতাপাতা দিয়ে আগুনকে অনির্বাণ রাখল গুহার মধ্যে বছরের পর বছর।

আদিম যুগের গুহাবাসী মানুষ যে আগুনের ব্যবহার জানত তার

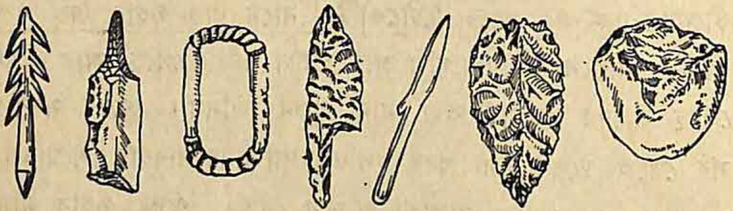
এক চমকপ্রদ নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে চীন দেশের এক গুহায়। চীনের পিকিং-এর কাছে **'চৌকৌটিন'** নামে এক গুহায় এক রকম প্রাচীন মানুষের মাথার খুলি আর কঙ্কাল পাওয়া গেছে, আর পাওয়া গেছে তাদের ব্যবহার করা নানা রকম জিনিস। এদের সম্পর্কে সব থেকে উল্লেখযোগ্য খবর হল এরা আগুনের ব্যবহার শিখেছিল। জীবজন্তুর মাংস এরা আগুনে পুড়িয়ে খেত। এদের গুহায় নানা ধরণের জন্তু-জানোয়ারের আধপোড়া হাড় পাওয়া গেছে। এই সব মানুষের নাম দেওয়া হয়েছে **'পিকিং ম্যান'** বা **'পিকিং মানব'**। পণ্ডিতরা মনে করেন এরা অন্তত তিন লক্ষ বছর আগে এখানে বাস করত। পিকিং মানবরা নিজেরা আগুন জ্বালাতে জানত কিনা তার সঠিক প্রমাণ অবশ্য নেই। হয়ত মানুষ নিজে আগুন জ্বালাতে শিখেছিল আরও অনেক পরে। পাথরে পাথরে ঠুকলে বা শুকনো কাঠে কাঠে ঘষলে আগুনের স্ফুলিঙ্গ বের হয়। এটা লক্ষ্য করেই হয়ত আদিম মানুষ সেই স্ফুলিঙ্গ থেকে একদিন আগুন জ্বালাতে শিখেছিল।

আগুনের ব্যবহার জানলেও কিন্তু আদিম মানুষ তখনও কোন খাদ্য উৎপাদন করতে জানত না। প্রকৃতি রাজ্য থেকে তারা খাদ্য সংগ্রহ করে খেত—সে গাছের ফল-মূল হোক, বনের পশু শিকার করে বা জলের মাছ ধরেই হোক। সে যুগের আদিম মানুষ ছিল নিতান্তই **খাদ্যসংগ্রহকারী জীব**।

২। পুরা-প্রস্তর যুগ

সে যুগের মানুষ নানা রকম হাতিয়ারের ব্যবহার শিখেছিল। পাথর ভেঙে নিয়ে তার ধারালো আর সূঁচালো দিকটাকে কুড়ুল বা বর্শার মত ব্যবহার করত। তাদের এই পাথরের হাতিয়ারগুলো

ছিল খুবই মামুলি ধরণের আর অমসৃণ। যে যুগে আদিম মানুষ এইসব



পুরা-প্রস্তর যুগের হাতিয়ার

অমসৃণ পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করত সে যুগটাকে বলা হয় **পুরাতন প্রস্তর যুগ** বা **পুরা-প্রস্তর যুগ**।

৩। নব-প্রস্তর যুগ

আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে সে যুগের মানুষ পাথরের অস্ত্র-শস্ত্র তৈয়ারীর ব্যাপারে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করল। তারা পাথর ভেঙে নিয়ে তাকে ঘষে মেজে ধারালো আর মসৃণ করে নিতে শিখল। এই সব পাথরের হাতিয়ারগুলোকে ধরবার সুবিধার জন্য তাতে ছেঁদা করে গাছের ডালের বা হাড়ের হাতল লাগিয়ে নিতেও শিখেছিল। এ যুগটাকে বলা হয় **নতুন** বা **নব-প্রস্তর যুগ**।



নব-প্রস্তর যুগের হাতিয়ার

অবশ্য পুরা-প্রস্তর যুগ আর নব-প্রস্তর যুগের মাঝখানে আর একটা মধ্যবর্তী স্তরের কথা বলা হয়। একে **মধ্য-প্রস্তর যুগ** বলে। এ যুগের মানুষের হাতিয়ারগুলো পুরা-প্রস্তর যুগের তুলনায় কিছুটা উন্নত ছিল। যাই হোক, নব-প্রস্তর যুগের মানুষ তীর ধনুকের

ব্যবহারও শিখেছিল অনুমান করা হয়। এতে তাদের শিকারের অনেক সুবিধা হয়েছিল। এমনকি তারা হাড়ের সূক্ষ্ম সূঁচের ব্যবহারও শিখেছিল। তা দিয়ে তারা পশুর চামড়া সেলাই করে পোষাক বানাত। এ যুগের মানুষের ব্যবহারের অনেক হাতিয়ারের নিদর্শন পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া গেছে—ইউরোপের দক্ষিণে, পশ্চিম এশিয়ায়, আফ্রিকায়, চীনে ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে।

মানুষ খাদ্য উৎপাদন করতে শিখল : নব-প্রস্তর যুগের গুহাবাসী মানুষ দল বেঁধে শিকার করতে যেত আর মেয়েরা ঘরে থেকে শিশুদের দেখাশোনা করত। তাদেরই হয়ত কেউ কোনদিন লক্ষ্য করেছিল আলগা মাটিতে ফেলে দেওয়া কোন গাছের বীজ থেকে গাছ হয়। সেই গাছে অসংখ্য ফল ধরে। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে সে যেমন অবাক হয়েছিল, তার আনন্দও নিশ্চয় হয়েছিল খুব। এটাই হল কৃষি আবিষ্কারের গোড়ার কথা। অনেকে মনে করেন কৃষিকাজ আবিষ্কারের কৃতিত্বটা মেয়েদেরই প্রাপ্য। এই আবিষ্কারের ফলে মানুষের জীবনে এল বিরাট পরিবর্তন। এখন আর মানুষ খাদ্যের জন্য কেবল প্রকৃতির বুকে নির্ভর করে থাকল না, সে এবার নিজেই খাদ্য শস্য উৎপাদনে সচেষ্ট হল। বুনো গম, বার্লির বীজ বুনে মানুষ খাদ্য শস্য উৎপাদন করে, খাদ্য সংগ্রহ প্রাণী থেকে **খাদ্য উৎপাদনকারী প্রাণীতে** পরিণত হল। সভ্যতার পথে মানুষের এ একটা মস্ত পদক্ষেপ।

নব-প্রস্তর যুগে জীবন মানের ক্রমোন্নতি : নব-প্রস্তর যুগের মানুষ তার বুদ্ধি আর কঠোর শ্রমের সাহায্যে নতুন নতুন জিনিসের উদ্ভাবন করে জীবনের মানকে অনেক উন্নত করে ফেলল। তীর ধনুকের ব্যবহার আর কৃষির আবিষ্কার তাদের পশুপালনে আরও উৎসাহিত করল। শিকারযোগ্য সব প্রাণীকে হত্যা না করে তারা তাদের আবাস স্থলের কাছাকাছি কোন উপত্যকায় আটকে রেখে পশুকে পোষ মানাল। এই পশুকে তারা কৃষিকাজেও ব্যবহার করতে শুরু করল।

কাদামাটি আগুনে পোড়ালে জল ও অগ্নি নিরোধক হয়—এটা লক্ষ্য করে তারা মাটির জলপাত্র, বাসন-কোসন বানাতে লাগল। মৃৎপাত্র বানানোর চাকের ব্যবহার তারা জানতো। চীন দেশে এবং মিশরের প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষগুলোতে কুমোরের চাকের ব্যবহারের নিদর্শন আছে।

পরিধানের বস্ত্রও সে যুগের মানুষ বুনতে শিখেছিল। পশুর লোম পাকিয়ে সুতো করে তারা কাপড় বুনতো। নলখাগড়া দিয়ে পাটি, মাছুর. ঝুড়ি বুনতো।

সে যুগের মানুষ ক্রমশ গুহা ছেড়ে বাড়ি-ঘর তৈরী করে বাস করতে লাগল। পশুর চামড়া আর কাঠের খুঁটি দিয়ে যেমন তাঁবু বানাত আবার মাটি, কাঠ, পাথর দিয়ে বড় বড় অট্টালিকা তৈরী করতেও শিখেছিল। তুর্কী দেশের সাইপ্রাসে সে যুগের চুনা পাথরের থামওয়ালা, কাঠের দরজা, কড়ি-বরগা দেওয়া মাটির দোতলা বাড়ির নিদর্শন পাওয়া গেছে। সুইজারল্যাণ্ডে হ্রদের জলে কাঠের খুঁটির উপর নির্মিত বাড়ি-ঘরের নিদর্শন পাওয়া গেছে। জন্তু-জানোয়ারের আক্রমণের ভয়েই হয়ত তারা হ্রদে বাস করত। কাঠ, পাথর দিয়ে ঘিরে সে যুগের মানুষ বাড়ি-ঘরকে সুরক্ষিত করত।

সে যুগের যাযাবর জাতির লোকের স্থায়ী বসতি ছিল না। পশুর পাল নিয়ে গোচারণ ভূমির সন্ধানে বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াত। পশুকে তারা তাদের জিনিসপত্র বহনের বাহন হিসাবে ব্যবহার করত। বিশেষ করে তারা গাধার পিঠে বোঝা চাপিয়ে চলাফেরা করত। তখনও সে যুগের মানুষ ঘোড়াকে পোষ মানাতে শেখেনি। কাঠের গুঁড়ি জলে ভাসিয়ে তারা জলাশয় পার হয়ে যেত। গাছের গুঁড়িকে চেঁচে ফাঁপা করে ডোঙ্গা বানিয়ে তাতে চেপে নদী, হ্রদ এমনকি ছোট খাট উপসাগর অনায়াসে পার হয়ে যেত। এই ভাবে নব-প্রস্তর যুগের মানুষ ধাতু যুগের উন্নততর সভ্যতার সোপান রচনা করে রাখল।

পরিবার জীবন ঃ প্রস্তর যুগের প্রথম দিকে সে যুগের মানুষ শিকারের মধ্য দিয়ে পরস্পরের ঘনিষ্ট হয়ে ওঠে। তারা দল বেঁধে এক পরিবারে বাস করত। পরিবারের সকলের মধ্যেই এক রক্তের সম্পর্ক থাকত। পুরুষরা শিকার করতে, মাছ ধরতে যেত আর মেয়েরা শিশুদের নিয়ে ঘরে থেকে নানা ধরণের গৃহস্থালির কাজ করত। শিশুরা মেয়েদের কাজে সাহায্য করত। কৃষির সূচনা হলে এই পরিবারের বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়। কারণ, নব-প্রস্তর যুগের হাতিয়ারে জমি চাষ করতে অনেক লোক মিলে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হত। জমির ফসল, গবাদি পশু ও অন্যান্য সম্পত্তির উপর ছিল সকলের সমান অধিকার। পরিবারের অভিজ্ঞ ও বয়স্কদের সকলে মান্য করত।

সে যুগের মানুষের বিশ্বাস ঃ নব-প্রস্তর যুগের মানুষের আঁকা নানা রকম গুহা চিত্র পাওয়া গেছে। সেই সব বিচিত্র ছবি থেকে সে যুগের মানুষের বিশ্বাস ও ধারণার কথা জানা যায়। ফরাসী দেশে ও স্পেনের বিভিন্ন গুহায় বুনো শুয়োর, হরিণ, ম্যামথ, ঘোড়া ইত্যাদি



নব-প্রস্তর যুগের গুহা চিত্র

প্রাণীর ছবি আঁকা রয়েছে। সে যুগের মানুষ মনে করত গুহার মধ্যে এসব প্রাণীর ছবি আঁকা থাকলে অনায়াসে তারা শিকারে

সফল হবে। পশুর চামড়া গায়ে জড়িয়ে, মাথায় হরিণের শিং এঁটে নৃত্যরত মানুষের ছবিও পাওয়া গেছে। পশুকে এইভাবে কল্পনায় নিজেদের আয়ত্তে আনার চেষ্টা থেকেই হয়ত সেকালে **যাদুবিদ্যার** সূচনা হয়েছিল। বয়স্ক অভিজ্ঞরাই এই সব কাজ করত। সমাজে সকলেই তাদের খুব সমীহ করত। তরুণরা তাদের বশে থাকত। এই সব যাদুকররাই পরবর্তীকালে ধর্মযাজক বা পুরোহিতের কাজ করত।

সে যুগের ভাষা ঃ প্রথম অবস্থায় আদিম মানুষ ইশারায় কথা বলত। বন্য পশুর মতই মুখে নানা রকম শব্দ করত। কিন্তু মানুষ পরিবার ও গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে পড়লে তখন শুধু ইশারায় কাজ চলত না। মানুষের সমাজ জীবন ক্রমশ বড় আর জটিল হয়ে উঠলে ভাবের আদান প্রদানের জন্য ভাষা সৃষ্টির প্রয়োজন হল। তখন মানুষ এক একটা বস্তুকে এক একটা শব্দের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করত। এর জন্য অবশ্য আমাদের এই পূর্ব পুরুষদের মস্তিষ্ক আর বাগযন্ত্রকে সঞ্চালন করে দীর্ঘকাল ধরে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে, তবেই ক্রমে ফুটে উঠেছে মানুষের ভাষা।

আদিম মানুষের ধর্ম ঃ হাজার হাজার বছরের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আদিম যুগের মানুষ আগুনকে আয়ত্ত করেছে, জমি চাষ করে ফসল উৎপাদন করতে শিখেছে, কাঠের গুঁড়ি বা নৌকা ভাসিয়ে হ্রদ, নদী, উপসাগর পাড়ি দিতে শিখেছে। কিন্তু তবু সে যুগের মানুষ খামখেয়ালী প্রকৃতির কাছে নিজেকে বড়ই অসহায় বোধ করত। বজ্র-বিদ্যুৎ সহ ঝড়-ঝঞ্ঝা, বন্যা, ভূমিকম্প, দাবানল, মহামারী প্রভৃতির বিধ্বংসী রূপ দেখে মানুষ ভয় পেত। তাদের অজ্ঞতার ফলে তারা এ সবের কোন কারণ খুঁজে পেত না। তারা ভাবত এ সবের মূলে নিশ্চয়ই কোন আলৌকিক শক্তি নিহিত রয়েছে। তাই এইসব অজ্ঞাত শক্তিগুলিকেই তারা দেব-দেবী রূপে কল্পনা করত আর স্তব স্তুতি ও উপাসনা দ্বারা তাদের তুষ্ট করার চেষ্টা করত। এই ভাবে অজ্ঞতা ও ভীতি থেকেই আদিম মানুষের মনে প্রথম ধর্মভাবের উদয়

হয়। তারা শিকার করতে ও মাছ ধরতে যাওয়ার আগে বা জমি চাষ করবার আগে তাদের কল্পিত দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে নানা রকম অর্ঘ্য নিবেদন করত। নিজেদের কল্পনা দিয়ে তারা দেব-দেবীর মূর্ত্তিও গড়ে নিত। দেব-দেবীর মূর্ত্তিগুলি তারা কখনও পশুর আকৃতিতে কখনও বা মানুষের আকৃতিতে গড়ে নিত।

অনুশীলনী

১। বিষয়মুখী ও মৌখিক প্রশ্ন ঃ

(ক) পৃথিবীতে মানুষের প্রথম আবির্ভাব হয় কত বছর আগে? (খ) আদিম মানুষ কোথায় বাস করত? (গ আদিম মানুষের খাদ্য কি ছিল? (ঘ) আদিম মানুষ যে আগুনের ব্যবহার জানত তার চমকপ্রদ নিদর্শন কোথায় পাওয়া যায়? (ঙ) খাদ্যসংগ্রহকারী জীব বলতে কি বোঝ? (চ কারা খাদ্য সংগ্রহকারী জীব ছিল? (ছ) অমসৃণ পাথরের হাতিয়ার কারা ব্যবহার করত? (জ) মসৃণ পাথরের হাতিয়ার কারা ব্যবহার করত? (ঝ) কৃষি-বিদ্যার সূচনা কি ভাবে হয়েছিল?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) আদিম মানুষের জীবন কেমন ছিল? (খ) আদিম মানুষ কি ভাবে আগুনের পরিচয় পেয়েছিল? (গ) পিকিং মানব যে আগুনের ব্যবহার জানত তার কি পরিচয় পাওয়া যায়? (ঘ) আদিম মানুষ আগুন জ্বালাতে শিখেছিল কিভাবে? (ঙ) খাদ্যসংগ্রহকারী আর খাদ্য উৎপাদনকারী জীব বলতে কি বোঝ? (চ) পুরা-প্রস্তর ও নব-প্রস্তর যুগ বলতে কি বোঝ? (ছ) মানুষের ভাষা কি ভাবে সৃষ্টি হয়েছিল?

৩। রচনা ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) মানুষ কিভাবে খাদ্য উৎপাদন করতে শিখেছিল? (খ) নব-প্রস্তর যুগের মানুষ কিভাবে তাদের জীবনের মানকে উন্নত করেছিল? (গ) সে-যুগের মানুষের ধর্ম বিশ্বাস কি রূপ ছিল? (ঘ) নব-প্রস্তর যুগের মানুষের বিচিত্র বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার কি পরিচয় পাওয়া যায়?

তৃতীয় অধ্যায় | # তামা ও ব্রোন্‌জের যুগ

সভ্যতার বিকাশ : আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে মানুষ ধাতুর ব্যবহার শিখেছিল। সে যুগের মানুষ পাথর নিয়ে কাজ করার সময় হয়ত লক্ষ্য করেছিল কোন কোন নরম ধরণের পাথর আগুনে গলে যায়। আর ঠাণ্ডা হলেই তার আকৃতি বদলে গিয়ে আবার শক্ত হয়ে ওঠে। আসলে কিন্তু তারা যেটাকে পাথর ভেবে ছিল সেটা পাথর নয়, তামার আকরিক। তারা এই ধাতুটাকে চিনে ফেলল, আর এটা গলিয়ে মাটির ছাঁচে ঢেলে নানারকম জিনিস বানাতে লাগল। তামা খুব নরম বলে তামা দিয়ে অস্ত্র-শস্ত্র বড় একটা না বানিয়ে তারা জলের পাত্র, বাসন-কোসন আর নানা প্রকার অলঙ্কার বানাত। তামার তৈরী এসব জিনিস সে-যুগের সভ্যতার অনেক ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া গেছে। যাই হোক, আরও কিছুকাল পরে তামার সাথে টিন মিশিয়ে মানুষ আর একটা মিশ্র ধাতুর আবিষ্কার করল। এই নতুন ধাতুটা হল ব্রোন্‌জ। এই ব্রোন্‌জ যেমন শক্ত আর তেমনই টেঁকসই হত। ফলে মানুষ ক্রমশ পাথরের হাতিয়ার ছেড়ে ব্রোন্‌জের হাতিয়ার ব্যবহার করতে শুরু করল। পৃথিবীতে প্রস্তর যুগের অবসান ঘটল। শুরু হল তামা ও ব্রোন্‌জের যুগ। তখনও মানুষ লোহার ব্যবহার শেখেনি।

তামা ও ব্রোন্‌জের ব্যবহার সভ্যতার ইতিহাসে এক বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এল।

নগর সভ্যতার বিকাশ : মানুষ যখন কৃষি আর পশুপালন নিয়ে থাকত তখন তাদের সমাজ ছিল মূলতঃ গ্রামীণ সমাজ। ধাতু যুগের সূচনা হলে গ্রামীণ সভ্যতার পাশাপাশি নাগরিক সভ্যতার

বিকাশ ঘটতে লাগল। ইট, কাঠ, পাথর নির্মিত ইমারত বহুল জনবসতি গড়ে উঠতে লাগল। এ যুগের বড় বড় শহরগুলির মধ্যে মিশরের মেমফিস, থিব্‌স, গিজে, মেসোপটেমিয়ার উর, এরিডু, উরুক, লাগাশ, নিনেভে, ব্যাবিলন, ভারতবর্ষের হরপ্পা, মহেঞ্জোদড়ো প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

উৎপাদনের ব্যাপকতা ঃ ধাতু যুগের সূচনা হলে মানুষের জীবন ও জীবিকায় ব্যাপক পরিবর্তন এল। ধাতু নির্মিত লাঙ্গল আর ফসল কাটার হাতিয়ার দিয়ে মানুষ এখন আগের তুলনায় আরও ব্যাপক ভাবে চাষ করে অনেক বেশী ফসল উৎপাদন করতে লাগল। ভূমির চাষ আর ফসল মাড়াই-এর কাজে গরু, ষাঁড় প্রভৃতি পশুর ব্যবহার শিখল।

বৃত্তির বিভাগ ঃ উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জীবন ধারণের উপযোগী খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য জিনিসের চাহিদা ক্রমশ বাড়তে লাগল। তামার অলংকার ব্রোন্‌জের হাতিয়ার, পরিধেয় বস্ত্রের চাহিদা বেড়ে গেল। একই মানুষের পক্ষে সব কিছু উৎপাদন করা সম্ভব হল না। সমাজের বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন কাজে পারদর্শী হয়ে উঠল। কৃষক, পশুপালক, বস্ত্র উৎপাদক, ধাতুশিল্পের কারিগর, ছুতোর, পাথর-খোদাই শিল্পী, ইমারত নির্মাতা ইত্যাদি বৃত্তিধারী মানুষের উদ্ভব হল।

ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ সে যুগে ব্যবসা বাণিজ্যও বিকশিত হতে লাগল। বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বনকারী মানুষের মধ্যে বিনিময় প্রথা গড়ে উঠল। খাদ্যশস্যের বিনিময়ে বস্ত্র বা ধাতু নির্মিত জিনিস বা গবাদি পশুর বিনিময়ে খাদ্য-শস্য বা বস্ত্র—এই ভাবে সে যুগের কেনা বেচা চলত। তখনও এখনকার মত টাকা পয়সার উদ্ভব হয়নি। সে যুগে বিদেশের সাথেও এই বিনিময়ের মাধ্যমে বাণিজ্য চলত। প্রাচীনকালে মিশর, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, ভারতবর্ষের মহেঞ্জোদড়ো প্রভৃতি দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল।

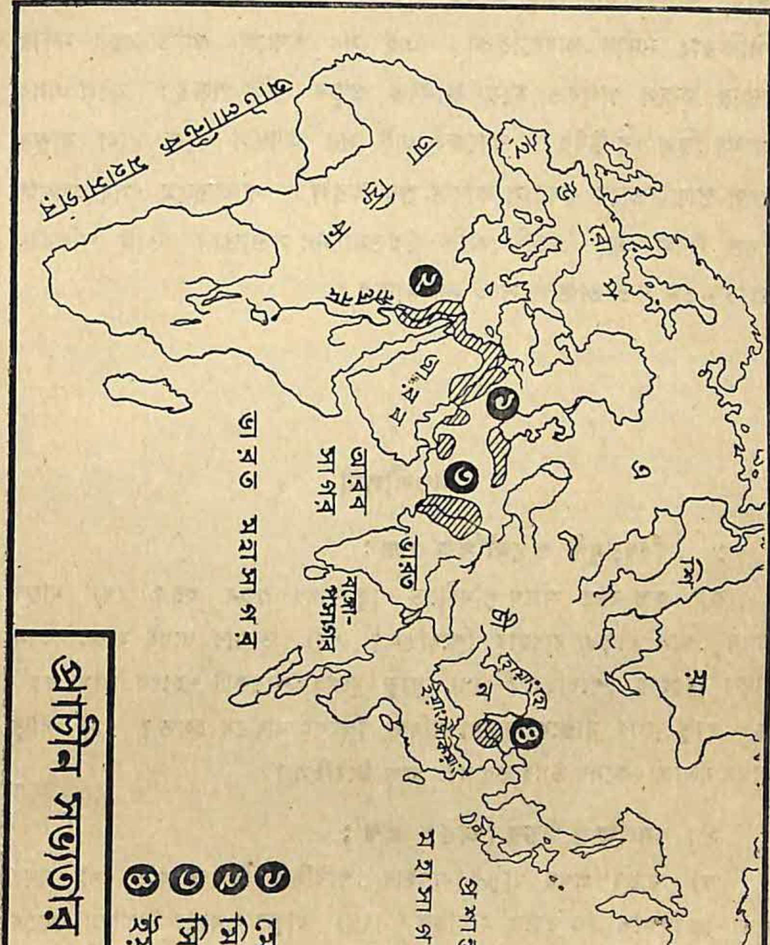
শ্রেণী বিভক্ত সমাজ ও রাষ্ট্রের উদ্ভব ঃ ধাতু যুগের সূচনায় কৃষিকাজ অনেক সহজ সাধ্য হয়ে ওঠে। জমি চাষের জন্য আগের মত আর অনেক লোকের সাহায্যের প্রয়োজন রইল না। সমাজ প্রধানেরা ভাল আর বড় জমিগুলি নিজেদের দখলে রাখল। ফলে আদিম সাম্যবাদী সমাজ ভেঙে পড়ল। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ভাল জমির দখল নিয়ে সংঘর্ষ বাড়তে লাগল।

কৃষির উন্নতির ফলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য-শস্য উৎপন্ন হতে লাগল। এই উদ্বৃত্ত ফসল সমাজের শ্রেণী বিন্যাসে এক মস্ত ভূমিকা পালন করল। এতকাল গোষ্ঠী লড়াইয়ে বিজয়ীদল পরাজিতদের ধরে এনে হত্যা করত। কিন্তু এখন পরাজিতদের হত্যা না করে উদ্বৃত্ত ফসল থেকে তাদের খাদ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রেখে তাদের দিয়ে পরিশ্রমসাধ্য কাজ করিয়ে নিত। এইভাবে যুদ্ধ বন্দীদের দলে দলে ক্রীতদাসে পরিণত করা হল। এই ক্রীতদাস সমাজের শ্রমের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল সে যুগের সভ্যতার ইমারত।

সমাজ প্রধানেরা ভাল ভাল আর বেশী বেশী জমি দখল করে ক্রমশ ক্ষমতাশালী হয়ে অসংখ্য ক্রীতদাসের মালিক হল। ক্রীতদাসরা যাতে অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে না পারে আর ভাল ভাল জমি গ্রাস করে নেওয়ার বিরুদ্ধে কৃষকেরা যাতে রুখে দাঁড়াতে না পারে তার জন্য সমাজ প্রধানেরা সশস্ত্র রক্ষী বাহিনী রাখত। ক্রমশ সমাজ প্রধানেরা এত শক্তিশালী হয়ে উঠল যে তারা সমাজ প্রধানদের সমিতির সভাও আর ডাকত না। ফলে সমিতি ভেঙে গেল। প্রধানেরা গায়ের জোরে যথেচ্ছ ভাবে চলত। এই ভাবে তারা এক একটা অঞ্চলকে নিজেদের দখলে এনে সর্বে সর্বা হয়ে বসল। এই ভাবে পৃথিবীতে প্রথম রাষ্ট্র ব্যবস্থার উদ্ভব হল।

নদীমাতৃক সভ্যতার বিকাশ ঃ কৃষিকাজ শেখার ফলে সে যুগের অনেকেই শিকার আর পশুপালকের জীবন ছেড়ে কৃষিকেই প্রধান

অবলম্বন করল। কৃষির উপযোগী পরিবেশের সন্ধানে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এসে সমবেত হল। প্রখর সূর্যের উত্তাপ আর পর্যাপ্ত



জল কৃষির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। প্রাচীন পৃথিবীতে এরকম উপযোগী

পরিবেশ যে কটা ছিল, তা হল পশ্চিম এশিয়ার ইউফ্রেটিস আর টাইগ্রীস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল **মেসোপটেমিয়া**, মিশরের **নীল নদের তীর**, ভারতবর্ষের **সিন্ধু নদের তীর** আর চীনের **হোয়াং হো ও ইয়াং সিকিয়াং** নদীর অববাহিকা। এই সব অঞ্চলে প্রতি বছর নদীর বন্যায় দুকূল প্লাবিত হয়ে জমিতে প্রচুর পলি পড়ত। ফলে এসব অঞ্চল ছিল খুব উর্বর। কাজেই এই সব অঞ্চলে দলে দলে মানুষ এসে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে শুরু করল। কালক্রমে এসব অঞ্চলে গড়ে উঠল এক একটি অতি উন্নতমানের সভ্যতা। তাই পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলি সবই নদীমাতৃক।

অনুশীলনী

১। বিষয়মুখী ও মৌখিক প্রশ্ন :

(ক) কত বছর আগে পৃথিবীতে ধাতু যুগের সূচনা হয়? (খ) মানুষ প্রথম কোন. ধাতুর ব্যবহার শিখেছিল? (গ) তামার পরেই মানুষ কোন ধাতুর ব্যবহার শিখেছিল? (ঘ) ধাতু যুগের কয়েকটি শহরের নাম কর। (ঙ) ধাতু যুগের মানুষের ব্যবসা-বাণিজ্য কিসের মাধ্যমে চলত? (চ) ধাতু যুগের সভ্যতা কিসের উপর ভর করে গড়ে উঠেছিল?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন :

(ক) মানুষ প্রথম ধাতুর ব্যবহার শিখেছিল কি ভাবে? (খ) নগর সভ্যতার বিকাশ কি ভাবে হয়েছিল? (গ) ধাতুর ব্যবহার উৎপাদন ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন আনল? (ঘ) ধাতু যুগে রাষ্ট্রের উদ্ভব কি ভাবে হয়? (চ) নদী-মাতৃক সভ্যতার বিকাশ হয় কি ভাবে?

৩। রচনা ভিত্তিক প্রশ্ন :

(ক) সভ্যতার বিকাশে ধাতুর অবদান কি? (খ) তামা ও ব্রোন্জ যুগে সমাজের শ্রেণী বিভাগ রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে কি জান? (গ) নদীমাতৃক সভ্যতার বিকাশ কোথায় কিভাবে হয়েছিল?

চতুর্থ অধ্যায়

১। মেসোপটেমিয়া

প্রথম সভ্যতার বিকাশ

(খ্রীঃ পূঃ ৩০০০—১৫০০ অব্দ)

অবস্থান ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সুবিধা ঃ পশ্চিম এশিয়ার ইউফ্রেটিস আর টাইগ্রীস নামে দুটি নদী ইউরোপের ককেসাস পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে পারস্য উপসাগরে পড়েছে। এই দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলকে বলে **মেসোপটেমিয়া**। মেসোপটেমিয়ার উত্তর অংশ পাহাড় সঙ্কুল আর দক্ষিণ অংশে রয়েছে বিস্তীর্ণ জলাভূমি।



প্রতি বছর ইউফ্রেটিস আর টাইগ্রীসের জল মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণ-

অংশকে প্লাবিত করত। ফলে এ অঞ্চলে পর্যাপ্ত পলি পড়ে জমিকে খুব উর্বর রাখত।

প্রায় ছ'হাজার বছরের আগে মেসোপটেমিয়ার উত্তর-পূর্ব আর পশ্চিমদিকের পাহাড় অঞ্চল থেকে নেমে এল দলে দলে নানা জাতের খাদ্য সন্ধানী লোক। তারা বড় বড় খাল কেটে নীচু জমির জল বের করে দিয়ে চাষের যোগ্য জমি তৈরী করে নিল, মাটির বাঁধের প্রাচীর তুলে ছোট, বড় শহর গড়ে তুলল।

নানা জাতের লোকের মধ্যে সুমেরীয়রাই এখানে প্রথম বসতি স্থাপন করেছিল বলে এদের সভ্যতা সুমেরীয় সভ্যতা বলেই পরিচিত।

সুমেরীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অনেক আধুনিক ঐতিহাসিক-দের ধারণা এ সভ্যতা প্রাচীন মিশরীয় বা অন্য যে কোন প্রাচীন সভ্যতা থেকে পুরানো। এমন কি কোন কোন বিষয়ে মিশর, মেসোপটেমিয়ার কাছে ঋণী ছিল।

এ অঞ্চলে পলি মাটিতে গম, বার্লি প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মাত, আর জন্মাত পর্যাপ্ত পরিমাণে খেজুর। জনবসতির চারদিকে খেজুর গাছ ছিল এই খেজুর থেকে ময়দা, মধু আর মদ উৎপন্ন হত। খেজুর গাছের আঁশ থেকে দড়ি, ঝুড়ি ইত্যাদি বোনা হত। সুমেরীয়-দের কাছে খেজুর গাছ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই খেজুর গাছকে এরা বলত **'জীবন বৃক্ষ'**।

এখানে ছিল পর্যাপ্ত পরিমাণে গোচারণ ভূমি। কাজেই কৃষির সাথে পশু পালনও এদের জীবিকার অন্যতম অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। শস্যের প্রাচুর্য্য এদের জীবনের আরও নানা দিককে বিকশিত করে তুলল। গড়ে উঠল বহু শহর, নগর ও বন্দর।

মেসোপটেমিয়ার শহরগুলো অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতে এবং পাহাড়ের উপর গড়ে উঠেছিল। শহরবাসী অধিবাসীদের মধ্যে তাঁতি, চর্মকার, কামার, কুমোর প্রভৃতি বৃত্তিধারী লোকজন নানা কাজের মধ্য দিয়ে সুমেরীয় সভ্যতার সমৃদ্ধি সাধন করেছিল।

রাষ্ট্র ব্যবস্থার সূচনা ও সাম্রাজ্যের বিকাশ ঃ সুমেরীয়রা

সর্বপ্রাচীন **এরিডু** শহরে আজ থেকে প্রায় ছ'হাজার বছর আগে কয়েক হাজার লোকের বসতি ছিল। এই সব লোকের উপর শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার প্রয়োজন দেখা দিল। এঁদের সাথে যোগ দিল সাধারণ পূজা-উপাসনার জন্য নির্মিত বিরাট বিরাট মন্দিরের পুরোহিতরা। এই পুরোহিত আর রাজপুরুষেরা মিলে দেবতাদের সন্তানরূপে নিজেদের পরিচয় দিয়ে দেশ শাসন করতে শুরু করেন। শাসনের কাজে পুরোহিতদের ক্ষমতাই ছিল সব থেকে বেশী। সুমেরীয় সভ্যতার ইতিহাসে এটা একটা বৈশিষ্ট্য। সুমেরীয় সভ্যতায় অনেক বড় বড় রাজা আর রাজবংশের উদ্ভব হয়েছিল। এঁদের মধ্যে **উর** রাজবংশের রাজত্বকালে সুমেরীয় সভ্যতার প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। এঁদের পোষাক-পরিচ্ছদ, ভাষা, সাহিত্য ও জীবন ধারণের মান সর্বাপেক্ষা উন্নত ছিল।

ক্রমে দক্ষিণের রাজ্যগুলো নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ করে দুর্বল হয়ে পড়ল। তখন আরবীয় গোষ্ঠীর নতুন একটি জাতি **সারগণ** নামে এক নেতার অধীনে সমস্ত ইরাক দেশের উত্তর ও দক্ষিণের নগর রাজ্যগুলোকে পদানত করে ইতিহাস বিখ্যাত **আগাদি রাজ-বংশের** প্রতিষ্ঠা করেন। এই আগাদীয় সাম্রাজ্য ইতিহাসে **আক্কাদীয়** সাম্রাজ্য নামে পরিচিত।

সমাজের শ্রেণী বিন্যাস: সুমেরীয়ার সমৃদ্ধ বিষয় সম্পত্তির উপর অনেকের লোভ ছিল। কাজেই তাদের বিষয় সম্পত্তি পাহারা দেওয়ার জন্য রক্ষীর প্রয়োজন হত। বিষয় সম্পত্তির মালিকরা শস্য বা গবাদি পশুর বিনিময়ে এদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিত। যুদ্ধ বিগ্রহ হলে যুদ্ধ বন্দীদের ধরে এনে ক্রীতদাসে পরিণত করা হত। সমাজে সম্পদশালী ধনী, দরিদ্র, কৃষক ও সকলের নীচে ক্রীতদাস ছিল।

সভ্যতার ক্ষেত্রে সুমেরুরীয়দের অবদান: সেকালের সুমেরীয় সভ্যতায় অনেক বড় বড় শহর গড়ে উঠেছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল উর, এরিডু, উরুক, আক্কাদ, নিনেভে, লাগাশ, নিপ্পুর, ব্যাবিলন

ইত্যাদি। সেকালের শহরগুলিতে স্তরে স্তরে উপরে উঠে যাওয়ার বিরাট বিরাট মন্দির থাকত। এই সব মন্দিরগুলোর নাম ছিল **জিগ্‌গুরাত**। উরুক শহরের সাদা রঙের জিগ্‌গুরাতটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানেই অনেক মহাকাব্য আর পুরাণের সৃষ্টি হয়েছিল। ধর্ম এবং মন্দিরকে কেন্দ্র করেই সুমেরীয়দের মধ্যে জ্ঞান-চর্চা শুরু হয়েছিল। সুমেরীয়রা বছরকে বারো মাসে ভাগ করত। আকাশে চন্দ্রের অবস্থান দেখে তারা মাস গণনা করত।

শিল্পঃ উর শহরে এক চমকপ্রদ প্রাচীর চিত্র পাওয়া গেছে। মোজেক করা দেওয়ালের উপর অনেক মূর্ত্তি বসিয়ে যুদ্ধের দৃশ্য, যুদ্ধ বন্দীদের দৃশ্য, প্রজাদের নিয়ে রাজার বিজয় মিছিলের দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। লাগাশ শহরে একটি চূণা পাথরে খোদাই করা রাজাকে কর দেওয়ার দৃশ্য আর দেবতার কাছে অর্ঘ্য নিবেদনের দৃশ্য পাওয়া গেছে। এখানে পাথরে খোদাই করা রাজা **গুডিয়ারের** মূর্ত্তিও পাওয়া গেছে।

ধাতুর ব্যবহারঃ ধতুশিল্পেও সুমেরীয়রা যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিল। তামা, ব্রোন্‌জ, সোনা ইত্যাদি ধাতুর কারিগরি বিদ্যায় দক্ষ লোকজনের অভাব ছিল না।

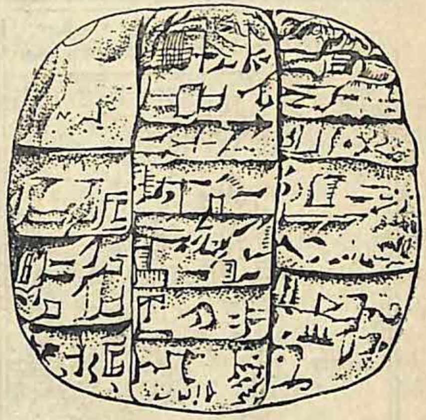
যাতায়াতঃ সুমেরীয়রা যাতায়াত ব্যবস্থায় পশুকে কাজে লাগাত। বিশেষ করে গাধার পিঠে বোঝা চাপিয়ে তারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করত। দূর দেশের সাথে যোগাযোগের জন্য তারা নৌকাও ব্যবহার করত।

বাণিজ্যঃ মেসোপটেমিয়াতে তামা, সোনা, রূপা ইত্যাদি মূল্যবান ধাতু বিশেষ পাওয়া যেত না। এ সব জিনিস তারা অন্য দেশ থেকে সংগ্রহ করত গম, বার্লি, খেজুর ইত্যাদি পণ্যের বিনিময়ে। এতে সহজেই অনুমান করা যায় সুমেরীয়দের ব্যবসা-বাণিজ্য দূর দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এমন কি মিশর এবং ভারতবর্ষের সিন্ধু অঞ্চলের সাথেও তাদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল।

লিপিঃ সুমেরীয়রা প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে এক

ধরণের সাংকেতিক লিপির ব্যবহার করত। সম্ভবত প্রজাদের খাজনার হিসাব রাখার জন্যই এই রকম সাংকেতিক লেখার প্রচলন হয়েছিল।

সুমেরীয় লিপিঃ গোড়ার দিকে সুমেরীয়রা প্রতীক চিত্রের সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করত। কালক্রমে সে সব প্রতীক চিত্র কতগুলো সাংকেতিক রেখায় পরিণত হয়। কাঠের কলম দিয়ে এরা কাদামাটির টালিতে লিখে নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে নিত। তাদের লিপিগুলো কীলকাকৃতি ছিল বলে সেগুলোকে **কীলক-লিপি** বলা হয়। সুমেরীয়রাই সর্বপ্রথম এই কীলক-লিপির প্রবর্তন করে।



সুমেরীয় টালি

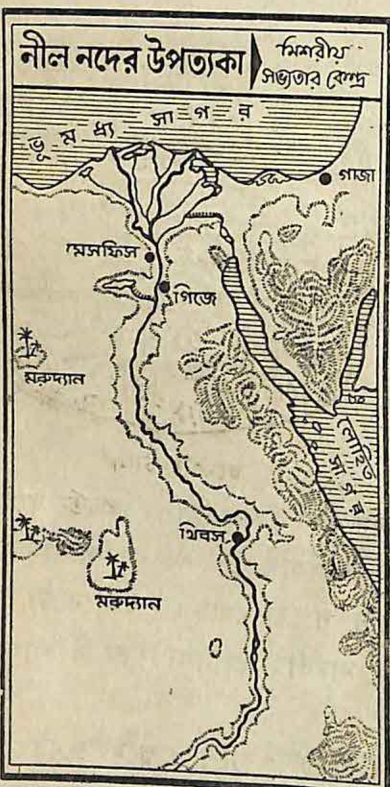
প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগেকার উর শহরের ধ্বংসাবশেষ থেকে একটা স্কুল বাড়ির সন্ধান পাওয়া গেছে। এখানে টালির তৈরী খাতা, ধর্মকথার গল্পের বই, নামতার তালিকা ইত্যাদি পাওয়া গেছে।

এসব থেকে বোঝা যায় বিদ্যা চর্চার ব্যাপারে সুমেরীয়দের বেশ উৎসাহ ছিল। মন্দিরের আশে পাশে গুরুমশাইরা পাঠশালা চালাতেন, সেখানে অসংখ্য টালির বইয়ের লাইব্রেরী থাকত।

২। মিশর

অবস্থান ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সুবিধাঃ আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্ব কোণে ভূমধ্যসাগরে পড়েছে নীলনদ। এই নীলনদ ধরে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হলে পাওয়া যাবে সূর্যকরোজ্জ্বল নীলনদের দেশ মিশর। সারা বছর ধরেই এখানে আবহাওয়া থাকে

খুব উষ্ণ আর বৃষ্টিপাতও বেশ কম। মরুভূমির বালি আর বালি পাথরে ভরা এই দেশটাতে নীলনদই যেন এর প্রাণ। প্রতি বছর নীলনদের বন্যায় প্রচুর পলি পড়ে বলে মিশরে মাটি খুব উর্বর।



সুমেরীয় সভ্যতার প্রায় সমসাময়িক কালে এখানেও এক বিরাট সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল।

প্রস্তর যুগের কাল থেকেই মিশরে মানুষের বসবাস শুরু হয়েছিল। বাঁধ দিয়ে নীলনদের জলকে আটকে খাল কেটে বিস্তীর্ণ জলাভূমির জল নিষ্কাশন করে তারা চাষ করত। গম, বার্লি, শন, আর তরি-তরকারি উৎপন্ন করত।

এখানকার মানুষ ছোট ছোট উপদলে বিভক্ত হয়ে এক একজন দলপতির অধীনে বাস করত। কাল-ক্রমে এই উপদলগুলোর দলপতিরা ক্ষমতাশালী হয়ে ছোট ছোট রাজ্য গড়ে তোলে। এই রাজ্যগুলোর মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকত। ক্রমে এক রাজ্য অপর রাজ্যগুলোকে গ্রাস করে মিশরে একটা সাম্রাজ্য গড়ে তোলে।

প্রাচীন মিশরে ফারাওদের শাসন: মিশরের রাজাদের বলা হত ফারাও। ফারাওগণ নিজেদের ঈগল দেবতা **হোরাসের** বংশধর বলে জাহির করতেন। আর তাঁরা থাকতেন সাধারণ

লোক চক্ষুর অন্তরালে বিরাট প্রাসাদের ভিতর। সাধারণ মানুষ ফারাওদের নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামাত না। দূর থেকেই তারা ফারাওদের সম্ভ্রম জানাত। অবশ্য অত্যাচারের মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে মাঝে মাঝে প্রজা বিদ্রোহ দেখা দিত। পুরোহিত, কর আদায়কারী ও যোদ্ধরা সর্বদা ফারাওদের স্বার্থ রক্ষায় তৎপর থাকত। এ ছাড়া ফারাওদের সেবায় নিযুক্ত থাকত অগণিত ক্রীতদাস।

খ্রীষ্টপূর্ব ৩৪০০ অব্দে মিশরের প্রথম ফারাও ছিলেন **মেনেস**। তাঁর অধীনে প্রথম সমগ্র মিশর ঐক্যবদ্ধ হয়। এর পর প্রায় দুই হাজার বছর ধরে বিভিন্ন বংশের ফারাওগণ মিশরে রাজত্ব করেন। প্রথম দিকের এই ফারাওদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন **মেনেস, খুফু, খাফরা, আমেনেমহেট** প্রমুখ। এদের রাজত্বকালেই মিশরের বিখ্যাত পিরামিডগুলি নির্মিত হয়।

খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় ১৭০০ অব্দে **হিক্সস্** নামে আরব দেশীয় এক মেষপালক জাতি মিশরের উপর আধিপত্য স্থাপন করে। হিক্সস্‌রা প্রায় ৫০০ বছর মিশরে রাজত্ব করেছিল।

পুরোহিতঃ ফারাওদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি রক্ষা করার জন্য পুরোহিতদের একটা বিরাট ভূমিকা ছিল। সভ্যতার গোড়া পত্তনের সময় থেকেই মিশরীয়রা তাদের কল্পিত দেবতাদের মন্দির নির্মাণ করে মন্দিরে দেবতার বিগ্রহ স্থাপন করত। মিশরের সমাজ ব্যবস্থায় ক্রীতদাস শ্রেণীর উদ্ভব হলে ক্রীতদাসদের শ্রমে বিরাট বিরাট পাথরের মন্দির নির্মিত হয়েছিল। এই সব মন্দিরের রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব থাকত পুরোহিতদের উপর। জনসাধারণ এই পুরোহিতদের মাধ্যমেই দেবতার কাছে তাদের অর্ঘ্য নিবেদন করত। পুরোহিতরা জনসাধারণের কাছে ফারাওয়াদের ভগবানের প্রতিনিধি বলে বর্ণনা করতেন। তাঁরা বলতেন, ফারওয়াদের নির্দেশ অমান্য করার অর্থ ভগবানের নির্দেশ অমান্য করা। মানুষের বিশ্বাস ছিল পুরোহিতরা সাক্ষাৎ ভগবানের সাথে কথা বলেন।

কর আদায়কারী ও যোদ্ধা: প্রাচীন মিশরে অসংখ্য রাজ-কর্মচারী ফারাওদের সেবায় নিযুক্ত থাকত। কর আদাকারী কর্মচারীরা কৃষকদের সম্পত্তির হিসাব রাখত। কৃষকরা তাদের উৎপাদনের একটা বড় অংশ কর হিসাবে সরকারী গোলায় জমা দিত। দেশের মধ্যে অসংখ্য সরকারী গোলায় এই সব কর জমা হত। কর আদায়কারী কর্মচারীরা প্যাপাইরাস কাগজের লম্বা ফর্দ আর নলখাগড়ার কলম নিয়ে করের হিসাব নিকাশে ব্যস্ত থাকত। প্রজাদের বিপুল পরিমাণ কর পেয়ে ফারাওরা বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন।

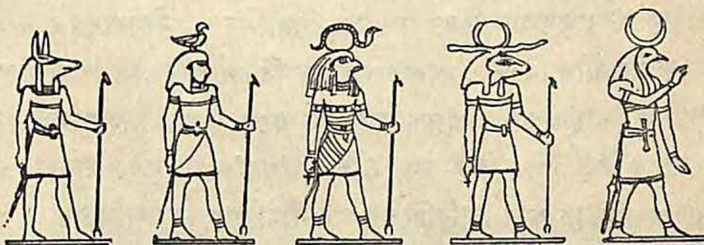
কর আদায়কারী কর্মচারী ছাড়াও বিপুল সংখ্যক সশস্ত্র দেহরক্ষী আর যোদ্ধা ফারাওদের সেবায় নিযুক্ত থাকত। প্রতিবেশী রাজ্যের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহ আর প্রজাদের বিদ্রোহ দমনের জন্য যোদ্ধাবাহিনীকে সব সময় প্রস্তুত থাকতে হত।

জনসাধারণের বৃত্তি ও ব্যবসা-বাণিজ্য: প্রাচীন মিশরের জনসাধারণের প্রধান বৃত্তি ছিল কৃষি, পশুপালন, বস্ত্র বয়ন, নৌ-বিদ্যা, তামা, ব্রোন্‌জ, সোনা, রূপা, প্রভৃতি ধাতু কাঠ ও পাথরের খোদাই এবং মৃৎশিল্পের কারিগরি বিদ্যা। এ ছাড়া সমাজের সর্ব নিম্ন স্তরে ছিল অসংখ্য ক্রীতদাস। এদের বিশেষ কোন বৃত্তি ছিল না। সামান্য খাওয়া-পরার বিনিময়ে মালিক প্রভুদের জন্য গতর খাটাই ছিল এদের একমাত্র কাজ।

বিভিন্ন উৎপাদকদের মধ্যে ব্যবসায়িক লেনদেন ছাড়াও দূর দেশের সাথে মিশরের বাণিজ্য চলত। ক্রীট, সিরিয়া, ব্যাবিলন এমনকি সুদূর দক্ষিণের নিগ্রোদের সাথেও মিশরের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। সোনা, রূপা, মূল্যবান পাথরের বিনিময়ে মিশরীয়রা রঙীন কাঁচ, সূক্ষ্ম শন-বস্ত্র, তামা ও ব্রোন্‌জের নির্মিত জিনিসপত্র বিদেশে রপ্তানি করত।

মিশরীয়দের ধর্ম বিশ্বাস: অতি প্রাচীনকাল থেকেই মিশরীয়দের জীবন ও জীবিকার উপর প্রকৃতির বিরাট প্রভাব ছিল।

তাই তাদের ধর্ম বিশ্বাসের উপরও প্রকৃতির বিরাট প্রভাব পড়েছিল। আদিমকালে মিশরীয়রা যখন কেবল শিকার করে জীবনধারণ করত, তখন থেকেই তারা কল্পনা করত দেবতারা দেখতে পশু আর পাখীর মত। খারাপ দেবতারা ভয়ঙ্কর ও হিংস্র জানোয়ারের মত দেখতে। পরবর্তীকালে তাদের দেবতারা মনুষ্যাকৃতি লাভ করে। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনুষ্যাকৃতির দেবতাদের মুখগুলো পশুর মতই ছিল। মিশরে

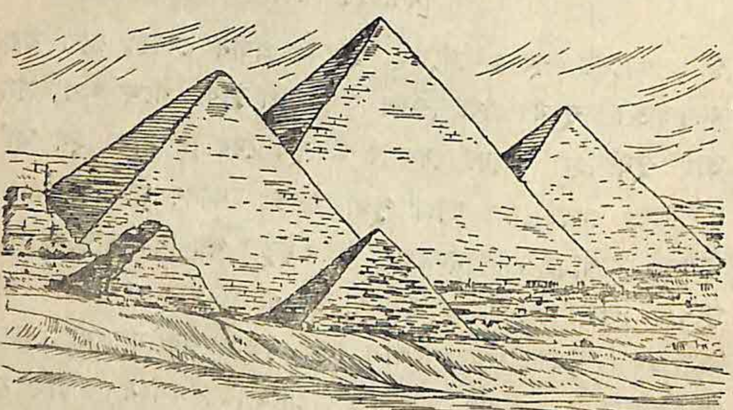


মিশরের দেব-দেবী

কৃষি কাজের সূচনা থেকেই সূর্যকে প্রধান দেবতা রূপে কল্পনা করা হত। সূর্যের প্রখর কিরণ ও উত্তাপ কৃষির পক্ষে অপরিহার্য। তাই সূর্য ছিল তাদের দেবরাজ। সূর্য দেবতার নাম ছিল 'রা'। নীলনদের দেবতাকেও তারা পূজা করত। কারণ নীলনদই তাদের বাঁচিয়ে রেখেছিল। 'ধর্মরাজের' অর্থাৎ মৃত্যুর পর যিনি মানুষের পাপ পুণ্যের বিচার করেন, তাদের শাস্তি বা পুরস্কার দেন, তাঁর নাম 'ওসিরিস। মিশরীয়দের বিশ্বাস ছিল মৃত্যুর পর মানুষের দেহকে রক্ষা করলে তার আত্মা আবার তার দেহে ফিরে আসে। তাই মৃত ব্যক্তিকে জীবনধারণের উপযোগী খাদ্য পানীয় সহ আরও নানারকম জিনিস দিয়ে কবর দেওয়া হত। মৃত দেহ যাতে নষ্ট না হয়ে যায় তার জন্য নানারকম প্রক্রিয়ায় মৃত দেহ রক্ষার ব্যবস্থা করা হত। এই ধরণের সংরক্ষিত মৃতদেহকে বলা হয় 'মমি'। মিশরে এরকম তিন, চার হাজার বছর আগেকার অনেক মমি পাওয়া গেছে। ফারাও এবং অভিজাত ধনী ব্যক্তিরা ছাড়া দরিদ্রদের এরকম মৃত দেহ সংরক্ষণের

সামর্থ্য ছিল না। কারণ এটা ছিল খুব ব্যয় সাধ্য ব্যাপার। দরিদ্ররা মৃত দেহের সাথে কাঠের মূর্ত্তি খোদাই করে কিছু খাদ্য পানীয় সহ মৃতের কবর দিত। ক্রীতদাসদের কেবল সাধারণ ভাবে কবর দেওয়া হত।

মিশরের পিরামিড ঃ সভ্যতার ইতিহাসে প্রাচীন মিশরের অবদান অসামান্য। অত্যাশ্চার্য স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের এমন নজীর প্রাচীন ইতিহাসে খুব কমই আছে। প্রাচীন মিশরের স্থাপত্য শিল্পের প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয় মিশরের পিরামিড। নীলনদের বাম তীরে মরুভূমির ধারে মিশরীয় ফারাওদের সমাধি সৌধ বিশাল পিরামিডগুলি আজও মানুষকে বিস্ময়ে হতবাক্ করে দেয়। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় পিরামিড হল ফারাও **'খুফু'**-র। এর উচ্চতা একশ পঞ্চাশ মিটার আর চারিদিকের পরিসীমা এক কিলোমিটার। গ্রীক ঐতিহাসিক **হেরোডোটাসের** বিবরণ থেকে জানা যায়, একলক্ষ



মিশরের পিরামিড

মানুষের ত্রিশ বছরের নিরলস পরিশ্রমে এই পিরামিড নির্মিত হয়েছিল। নীলনদের অপর পার থেকে আড়াই টন ওজনের এক একটি পাথর নৌকা করে আনা হত। এমনি অগণিত পাথর কাঠের গুঁড়ির সাহায্যে ধাপে ধাপে উপরে তুলে সুউচ্চ পিরামিডটি নির্মিত হয়েছিল। কঠিন পরিশ্রম-সাধ্য কাজগুলো করান হত ক্রীতদাসদের দিয়ে

পিরামিডের সামনে থাকত মৃতদেহ রাখার মন্দির। পিরামিডের ভিতরকার সুরম্য কক্ষগুলোর দিকে তাকালে সেকালের মিশরীয় স্থপতি ও ভাস্কর শ্রমিকের কারুকার্য ও কর্মক্ষমতার উপর শ্রদ্ধা জাগে। মিশরের গিজে প্রান্তরে ফারাও **'খুফু'** ও তাঁর পুত্র **'খাফ্‌রে,'** এবং পরবর্তী ফারাও **'মেনকাউরের'** পিরামিডগুলো এখনও দেখা যায়। গিজে প্রান্তরে পাথরে খোদাই করা বিখ্যাত **'স্ফিংস'** মূর্তিটি ফারাও খাফরে নির্মাণ করিয়েছিলেন।

মিশরীয় লিপি : এখন থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে থেকে মিশরীয়দের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের কথা বংশ পরম্পরায় মানুষের মুখে মুখে চলে আসছিল। তার বহু আগে থেকেই তাদের ভাষাকে লিপির মাধ্যমে লিখিত রূপ দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল। তাদের এই চেষ্টার ফলে



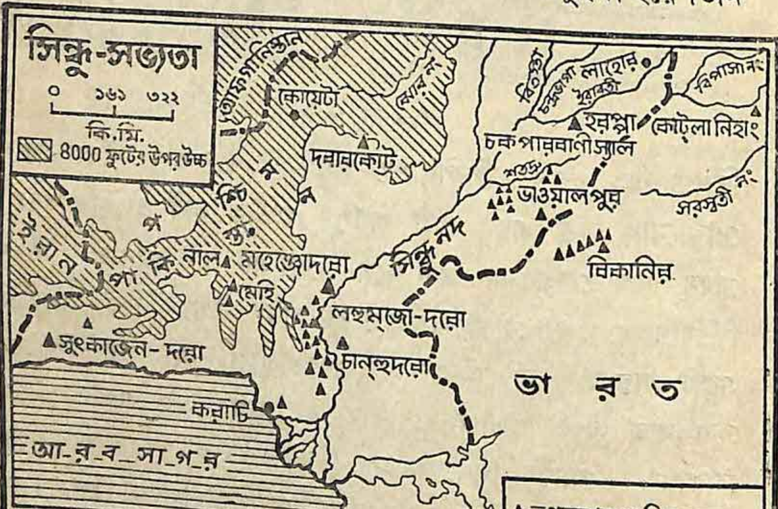
মিশরীয় লিপি

মিশরে এক ধরণের লিপির উদ্ভব হল। প্রথমে তারা বিভিন্ন বস্তুকে বোঝানোর জন্যে এক একটি অর্থপূর্ণ প্রতীক ছবি ব্যবহার করত। যেমন, জল বোঝানোর জন্য জলের ঢেউ-এর ছবি আঁকত। বিপুল পরিমাণ বা সংখ্যা বোঝানোর জন্য দুই বাহুর উপর দিকে প্রসারিত একটি মানুষের ছবি আঁকত। পরবর্তীকালে এই চিত্র লিপিতে কেবলমাত্র একটি শব্দকেই বোঝাত না শব্দের এক একটি অংশকে বোঝাত। প্রাচীন মিশরের এই চিত্র লিপিকে **'হিরোগ্লিফ'** বলা হত। এই রকম কয়েক সহস্র 'হিরোগ্লিফ' লিপি মিশরীয়দের ছিল। অবশ্য এই কয়েক সহস্রের মধ্যে মাত্র সাড়ে সাতশোর মত লিপি মিশরীয়রা ব্যবহার করত। মিশরের এই লিপির উদ্ভাবনী চর্চায় পুরোহিতদের যথেষ্ট অবদান ছিল। মিশরীয়দের লিপি সম্পর্কে বলতে গিয়ে আর একটা কথা না বললে এই লিপির কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মিশরীয়রা লিখত **'প্যাপাইরাস'** নামে এক ধরণের

নলখাগড়া জাতীয় গাছের বাকলে। এই 'প্যাপাইরাস্' থেকেই ইংরাজী 'পেপার' কথার উৎপত্তি হয়েছে। প্যাপাইরাসের ওপর লেখা মিশরের অনেক পৌরাণিক কাহিনী, গান ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা জানা গেছে। প্যাপাইরাস দুর্মূল্য হয়ে পড়লে সাধারণ লোকেরা ভাঙ্গা মৃৎ-পাত্রের উপর লিখত। গুরুর কাছে ছাত্রের লেখা অনুশীলনের এরকম অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে।

৩। সিন্ধু সভ্যতা

আবিষ্কার কাহিনী : বিখ্যাত ঐতিহাসিক **রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়** ১৯২২ সালে একবার সিন্ধু প্রদেশের উপর দিয়ে ট্রেনে ভ্রমণ করার সময় একটা মস্ত ঢিবি দেখতে পান। কৌতুহলী হয়ে তিনি



সেই জায়গায় নেমে পড়েন এবং একটু খোড়াখুঁড়ি করতেই বহু প্রাচীন এক শহরের ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন দেখতে পান। রাখালদাস তখন তদানীন্তন ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তা স্যার জন মার্শালকে বাপারটা জানান। জন মার্শাল তখন ঐ অঞ্চল খননের

নির্দেশ দেন। এই খননের ফলে সেখানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক উন্নতমানের সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়। পরে **শ্রীদয়ারাম সাহানীর** মত আর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও এই আবিষ্কারে যোগ দেন। তাঁদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে সমগ্র সিন্ধুনদের উপত্যকা জুড়ে অনেকগুলি অঞ্চলে এই প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়।

সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলার **মহেন্‌জোদরো** এবং পাঞ্জাবের মণ্টোগোমারী জেলার **হরপ্পাতেই** সিন্ধু সভ্যতার সব থেকে উল্লেখযোগ্য নিদর্শনগুলি পাওয়া যায়। এ ছাড়া আরও যে সব অঞ্চলে এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে তার মধ্যে **সুৎকাজেনদরো, চানহুদরো, লহুমজদরো** প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার এই সব অঞ্চলগুলোর সবই বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত। তবে ভারতের লোথাল ও রূপার প্রভৃতি অঞ্চলেও এই সভ্যতার কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে।

পণ্ডিতদের গবেষণার ফলে জানা যায় এই সভ্যতার পত্তন হয়েছিল প্রাগৈতাহিসিক তাম্র-প্রস্তর যুগে, আজ থেকে কম করেও প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে।

নগর পরিকল্পনা : অন্যান্য প্রাচীন নদীমাতৃক সভ্যতার মত সিন্ধু সভ্যতার মহেন্‌জোদরো ও হরপ্পা খুব উন্নতি লাভ করেছিল। এই সভ্যতা ছিল পুরোপুরিই নগর ভিত্তিক।

মহেন্‌জোদরোর নগরটি ছিল সুপরিকল্পিত সোজা রাজপথ দ্বারা বিভিন্ন পল্লীতে বিভক্ত। পথের দুই ধারে পোড়া মাটির ইট দিয়ে তৈরি একতল ও দ্বিতল বিশিষ্ট অট্টালিকা। অট্টালিকার ভিতরে ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ। রাজপথের উপর অট্টালিকার নীচের তলায় দোকান এবং পার্শ্ববর্তী গলি দিয়ে বাড়ির প্রবেশ পথ, বাড়ির ভিতরে উঠান, উঠানে জলের কূপ। এখানে একটি সাধারণের ব্যবহারের জন্য স্নানাগার পাওয়া গেছে। স্নানাগারটি দৈর্ঘ্যে ৩৯ ফুট, প্রস্থে ২৩ ফুট এবং গভীরতায় আট ফুট। এই স্নানাগারে

উপযুক্ত জল নিকাশের ব্যবস্থাও ছিল। এখানে একটি শস্যাগার পাওয়া গেছে। শস্যাগারটি দৈর্ঘ্যে ১৫০ ফুট এবং প্রস্থে ৭৫ ফুট। শস্যাগার ও স্নানাগারের কাছেই পাওয়া গেছে নগর রক্ষক তুর্গ।

সিন্ধু সভ্যতার অপর প্রধান কেন্দ্র হরপ্পাতেও অনুরূপ নগর পরিকল্পনার নিদর্শন রয়েছে। হরপ্পার শস্যাগারটি অপেক্ষাকৃত ছোট। শস্যাগারের পাশে যে ছোট ছোট খুপরি ঘরের নিদর্শন রয়েছে, তাতে হয়ত শ্রমিক মজুর শ্রেণীর লোক বাস করত।

সেকালের নগর পরিকল্পনায় জল নিষ্কাশন ও পয়-প্রণালী ব্যবস্থাও ছিল খুবই বিস্ময়কর। ভূ-গর্ভস্থ পাকা নর্দমা ও পোড়া মাটির নল দিয়ে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ছিল। ভাবতে অবাক লাগে, এখন থেকে চার পাঁচ হাজার বছর আগে সিন্ধুবাসীরা যে নগর পরিকল্পনা করেছিল তা অনেকটা এখনকার নগর পরিকল্পনার মতই ছিল।

খাদ্যদ্রব্য, পোশাক ও অন্যান্য নিদর্শন :

খাদ্য : সিন্ধু সভ্যতার মানুষ নিরামিষ এবং আমিষ তুরকম খাদ্যই খেত। তাদের প্রধান খাদ্য ছিল—গম, যব, তিল, মটর, রাই প্রভৃতি শস্য; মেষ, শূকর, কচ্ছপ প্রভৃতির মাংস; মাছ, শুঁটকিমাছ, তুধ, নানা রকম তরিতরকারি প্রভৃতি।

পোশাক ও অলঙ্কার : এখানকার লোকেরা প্রধানত কার্পাস জাত সূতী ও পশমের বস্ত্র ব্যবহার করত। নারী, পুরুষ উভয়েই তুই খণ্ড বস্ত্র ব্যবহার করত। তারা অলঙ্কার পরতে ভালবাসত। নারী, পুরুষ সকলেই অলঙ্কার পরত। সোনা, রূপা, ব্রোন্‌জ, শঙ্খ ও মূল্যবান পাথরের নানা রকম অলঙ্কার এখানে পাওয়া গেছে। মেয়েরা এখনকার মেয়েদের মতই চুল বাঁধত।

অন্যান্য ব্যবহার্য : নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের মধ্যে তামা, ব্রোন্‌জ, পাথর ও মাটির তৈরী বাসন-কোসন, মাটির হাড়ি, কড়াই, থালা-বাটি,

গ্লাস, সরা, মালসা, কলসী প্রভৃতির নিদর্শন পাওয়া গেছে। আর

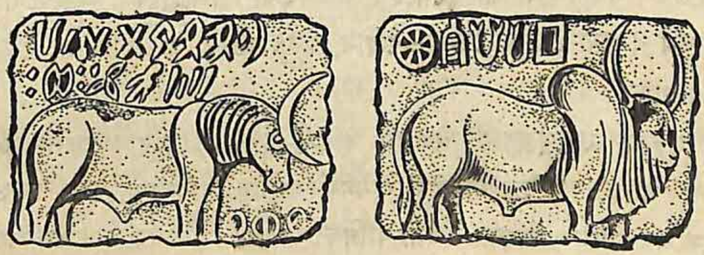


মাটির পাত্র

পাওয়া গেছে চকমকি পাথরের ছবি, পাথরের কুঠার, লাঙ্গলের ফাল, মাছ ধরার বড়শি, সেলাই করার সূঁচ ইত্যাদি।

সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা সম্ভবত ঘোড়া আর লোহার ব্যবহার জানত না। লোহা ও ঘোড়ার কোন নিদর্শন এখানে পাওয়া যায় নি।

লিপি ঃ সেকালের সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা জিনিস বেচা-কেনার জন্য বিভিন্ন ধরণের ওজনের মাপ ব্যবহার করত। বিভিন্ন



সীল মোহর

পরিমাণের পাথরের ওজন ও অজ্ঞাত লিপিযুক্ত পাথরের সীল মোহর পাওয়া গেছে বেশ বোঝা যায়, সিন্ধু সভ্যতার লোকেদের মধ্যে লেখা পড়ার প্রচলন ছিল। দুঃখের বিষয় সিন্ধু সভ্যতার লিপির পাঠোদ্ধার এখনও সম্ভব হয়নি। এবং লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব

হলে আমরা সিন্ধু সভ্যতা সম্পর্কে আরও অনেক মূল্যবান তথ্য জানতে পারব।



সিন্ধু লিপি

কারিগরি বিদ্যা : সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শনগুলোর মধ্যে নানা রকম কারিগরি শিল্পের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া গেছে। কামার, কুমোর, তাঁতী প্রভৃতি কারিগরি শ্রেণীর লোকের সুন্দর সুন্দর হাতের কাজের নমুনা পাওয়া গেছে। ভাস্কর্য্য শিল্পেরও উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া গেছে, যেমন—ব্রোন্‌জের নর্তকী ও পাথরের যোগী মূর্ত্তি প্রভৃতি।

ব্যবসা-বাণিজ্য : এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যে মুদ্রার প্রচলন ছিল না। সম্ভবত শস্যের মাধ্যমে বিনিময় প্রথায় ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। বিদেশের সঙ্গেও তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। বিশেষ করে সেকালে মেসোপটেমিয়ার সাথে তাদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। সেকালের সিন্ধু অঞ্চলের কিছু সীল মোহর প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া গেছে। সূতি বস্ত্র অন্যান্য দ্রব্য মেসোপটেমিয়ায় রপ্তানি হত।

ধর্ম : সিন্ধু সভ্যতার ধর্ম বিষয়েও অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া গেছে। এখানকার লোকেরা গাছ, পাথর, ষাঁড়, সাপ

ও কুমীর ইত্যাদির পূজা করত। তারা প্রধানত শিবের উপাসনা করত। বিভিন্ন পশু পরিবৃত যোগী পশুপতি মূর্ত্তি পাওয়া গেছে। এ ছাড়া বিভিন্ন মাতৃকামূর্ত্তির নিদর্শন থেকে মনে হয় এখানকার লোকেরা এখনকার মত ভগবতী, কালী, মনসা ও চণ্ডী প্রভৃতি দেবীরও উপাসনা করত।

এখানে বিভিন্ন ভাবে মৃতের সৎকার করা হত। মৃতদেহ সমাধি দেওয়া হত, আবার আগুনে দাহ করাও হত। মৃতের অস্থি ও ভস্ম সংরক্ষণের প্রথা প্রচলিত ছিল।

সমাজের শ্রেণী বিন্যাস : সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্ত বিভিন্ন নিদর্শন থেকে সমাজের শ্রেণী বিন্যাসের একটা নিখুঁত ছবি পাওয়া যায়। এখানকার সমাজের বিভিন্ন বৃত্তিধারী মানুষ, যেমন—কামার, কুমোর, তাঁতী, কৃষক, ব্যবসায়ী, শ্রমিক-মজুর প্রভৃতির অস্তিত্ব ছিল। বিভিন্ন নিদর্শন থেকে মনে হয়, সিন্ধু সভ্যতার কালে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যথেষ্ট বৈষম্য ছিল। ধনীদের বড় বড় অট্টালিকার পাশে দীন-দরিদ্র মজুর শ্রেণীর লোকেদের থাকার জন্য খুপরীর মত ছোট ছোট ঘরের নিদর্শনও এখানে পাওয়া গেছে।

সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা : সিন্ধু সভ্যতা কারা গড়ে তুলেছিল সে সম্পর্কে খুব ধারণা পাওয়া মুস্‌কিল। তবে সেখানে যে সব মৃত মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গেছে সেগুলোর আকৃতি এবং বিশেষত্ব বিচার করে পণ্ডিতরা মনে করেন বিভিন্ন জাতির মানুষ যেমন—**ককেশীয়, নিগ্রিতস্, মঙ্গোলয়েড, ভূমধ্যসাগরীয়, আলপীয়** প্রভৃতির সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। বর্তমান সিন্ধু অঞ্চলের কোন কোন জাতির ভাষার সাথে দ্রাবিড় ভাষার কিছু কিছু মিল পাওয়া যায়। তাই অনেকে মনে করেন সিন্ধু সভ্যতা দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীর মানুষেরাই গড়ে তুলেছিল।

ধ্বংসের কারণ : সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসের কারণ সম্পর্কেও যথেষ্ট মতভেদ আছে। কারও কারও মতে সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হয়েছিল অনাবৃষ্টি জনিত প্রচণ্ড খরা বা অতিবৃষ্টি জনিত প্রবল বন্যার ফলে। আবার

কেউ কেউ বলেন, আর্যরা ভারতে আসার পথে সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস করেছিল।

সিন্ধু সভ্যতার গুরুত্ব ঃ সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কৃত হওয়ার আগে সকলের ধারণা ছিল আর্য সভ্যতাই ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা। কিন্তু এই সভ্যতা আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে সে ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হয়। আর্যরা ভারতে আসার দুই থেকে আড়াই হাজার বছর আগে সিন্ধু সভ্যতার পত্তন হয়েছিল। এ ছাড়া ভারতীয় সভ্যতায় সিন্ধু সভ্যতার প্রভাব অনেক।

৪। চীন

হোয়াং-হো ও ইয়াংসি-কিয়াং উপত্যকা (সভ্যতার বিকাশ) ঃ পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম দেশ চীন। চীনের পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল থেকে **হোয়াং-হো** আর **ইয়াংসি-কিয়াং** (কিয়াং কথার অর্থ নদী) উৎপন্ন হয়ে পূর্বদিকের ঢাল বেয়ে বিস্তীর্ণ উপত্যকার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসে পড়েছে প্রশান্ত মহাসাগরে। প্রতি বৎসর প্রবল বন্যায় হোয়াং-হো আর ইয়াংসি-কিয়াং উপত্যকার নিম্নভাগ প্লাবিত হত, ফলে প্রচুর পলি পড়ে এ অঞ্চলটা হয়ে উঠেছিল খুব উর্বর। চীনের প্রাচীনতম সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল এই অঞ্চলে।

খ্রীষ্টের জন্মের পাঁচ হাজার বছর কিংবা তারও আগে মধ্য এশিয়া থেকে একদল লোক চীনের এই নদী উপত্যকাগুলোতে এসে বসবাস শুরু করেছিল। সভ্যতার দিক থেকে এরা অনেক বেশী অগ্রসর ছিল। এরা কৃষিকাজ জানত এবং গোপালন-মেষপালনেও এরা অভ্যস্ত ছিল। এরা তখন বাড়ি-ঘর তৈরী করতে শিখেছিল।

অর্থনৈতিক জীবন ঃ প্রথমে কঠোর পরিশ্রম করে মাটির বাঁধ তুলে, খাল কেটে চাষের উপযোগী ভূমি তৈরী করে তারা এ অঞ্চলটাকে বাসের যোগ্য করে তুলেছিল। এ অঞ্চলের উর্বর

পলিমাটিতে তারা ধান, গম, বাজরা প্রভৃতি ফসল উৎপন্ন করত, আর পশুপালন করত। রেশমকীট থেকে সুন্দর ও শক্ত এক রকম সূতো সংগ্রহ করে তারা বস্ত্র বুনত। অতি প্রাচীনকাল থেকেই চীনের রেশমী সূতোর পৃথিবী জোড়া খ্যাতি। এ সব ছাড়াও, সেকালের চীনের লোকেরা তামা, ব্রোন্‌জ, সোনা, রূপা আর পাথর দিয়ে সুন্দর সুন্দর বাসন-কোসন আর নানা রকম ব্যবহারের জিনিস বানাত।

বহিরাক্রমণ ও আত্মরক্ষা ঃ সেই স্মরণাতীত কালে হোয়াং-হো আর ইয়াংসি-কিয়াংএর লোকেরা অনেকগুলো সমৃদ্ধ জনপদ গড়ে তুলেছিল। তাদের সম্পদের লোভে বাইরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নানা ধরণের যাযাবর জাতির লোকেরা এসে এই সব জনপদগুলোতে হামলা করে লুঠতরাজ করত। এই আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা এক একটি জনপদ ঘিরে মাটির উঁচু দেওয়াল তুলে জনপদ-গুলোকে সুরক্ষিত করার চেষ্টা করত।

শাসন ব্যবস্থা ঃ প্রায় চার হাজার বছরেরও আগে 'ইয়াও' বলে একজন লোকের উল্লেখ পাওয়া যায়।—ইনি নিজেকে সম্রাট বলে অভিহিত করতেন। আসলে তিনি হয়ত ছিলেন সমাজপতিরই সামিল। সে যুগের মেসোপটেমিয়া এবং মিশরে সম্রাট বলে যা বোঝাত তিনি সে রকম কিছু ছিলেন না। চীন দেশের লোকেরা প্রধানত কৃষি কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকত, কাজেই বহুকাল পর্যন্ত চীনে সুনির্দিষ্ট কোন শাসন প্রণালী গড়ে ওঠেনি। গোড়ার দিকে লোকেরা নিজেদের মধ্যে একজনকে সমাজপতি নির্বাচিত করে নিত। পরবর্তী-কালে এই সমাজপতির পদ বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ে। ইয়াও-এর মৃত্যুর পর যিনি সমাজপতি মনোনীত হয়েছিলেন তিনি ইয়াও-এর বংশধর ছিলেন না। পরবর্তীকালে রাজপদ বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ে। গোড়ারদিকে চারশো বছরেরও বেশী কাল ধরে **শিয়া বংশ** চীনদেশে রাজত্ব করেছিলেন। অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার মত চীনেও সেকালে ক্রীতদাস প্রথা ছিল।

কষ্টসাধ্য জীবন ঃ স্মরণাতীত কালের যে সমস্ত পরিশ্রমী মানুষ চীনের এই নদী উপত্যকার সভ্যতা গড়ে তুলেছিল, তাদের জীবন ছিল যেমনি কষ্টসাধ্য তেমনি ছিল অনিশ্চয়তায় ভরা। প্রচণ্ড অনাবৃষ্টির ফলে নিদারুণ জলাভাব, নয়ত অতিবৃষ্টির ফলে হোয়াং-হোর প্রবল বন্যা বার বার তাদের জীবনকে বিড়ম্বিত করত। বিশেষ করে হোয়াং-হোর অগভীর উপত্যকায় প্রায়ই প্রবল বন্যা হত। বন্যার প্রকোপে বার বার তাদের জনপদ ক্ষেত-খামার ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। আবার কঠোর পরিশ্রম করে তাদের নতুন করে সব কিছু গড়ে তুলতে হত। এই জন্য এতকাল পর্যন্ত হোয়াং-হোকে চীনের দুঃখ বলা হত।

পৌরাণিক কাহিনী ঃ চীনে প্রচলিত অনেক পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে একটি কাহিনী আছে বন্যা সম্পর্কে।

একবার প্রবল বন্যায় সারা দেশ ডুবে যায়। কেবলমাত্র পর্বতের চূড়াগুলো জলের উপর জেগে ছিল। সব মানুষ গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল পর্বতের চূড়ায়। দীর্ঘ দশ বছর পার হয়ে যায়, তবু বন্যার জল সরে না। তখন 'ঈ' নামে এক কর্মঠ ব্যক্তি দিন রাত কঠোর পরিশ্রম করে অনেকগুলো খাল কাটলেন, নদী উপত্যকাকে কেটে গভীর করে দিলেন। এরপর, বন্যার জল সরে গেল। সমতল ভূমি আবার জেগে উঠল। মানুষ ফিরে এসে আবার সেখানে বসতি গড়ে তুলল।

এই পৌরাণিক কাহিনীর মধ্য দিয়ে সেকালের চীনের মানুষ মানুষকেই বড় করেছে, মানুষের শ্রমকেই গৌরবান্বিত করেছে।

৫। নদীমাতৃক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য

প্রাচীন পৃথিবীতে প্রথম সু-সংবদ্ধ সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল নদী উপত্যকায়। মেসোপটেমিয়া, মিশর, সিন্ধু অঞ্চল এবং চীনের হোয়াং-হো ও ইয়াংসি নদীর তীরে প্রায় সম-সাময়িক কালের মধ্যে

অনেকগুলো সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। নদ-নদীকে আশ্রয় করে এই সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছিল বলে এগুলোকে নদীমাতৃক সভ্যতা বলা হয়।

বিভিন্ন সভ্যতার বৈশিষ্ট্যের মিল : পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের নদী উপত্যকায় বিভিন্ন জাতির মানুষ এই সভ্যতাগুলো গড়ে তুললেও সভ্যতাগুলোর মধ্যে কতগুলো সাধারণ মিল পাওয়া যায়। যেমন—

কৃষি ভিত্তিক সভ্যতা : কৃষিই ছিল এই সব অঞ্চলের মানুষের জীবন ও জীবিকার মূল ভিত্তি। কঠোর শ্রম আর অধ্যাবসায়ের সাহায্যে উপত্যকা অঞ্চলগুলোকে চাষ ও বাস যোগ্য করে তুলেছিল সে সব অঞ্চলের মানুষ। প্রকৃতির অনুকূল পরিবেশ মানুষকে এই সব অঞ্চলে আকৃষ্ট করেছিল। মানুষও প্রকৃতিকে বশ মানাতে চেষ্টা করেছে। প্রকৃতিকে বশ মানাতে গিয়ে নিজেরাও একটু একটু করে পরিবর্তিত হয়েছে। অতীতের বর্বর জীবন থেকে মুক্ত হয়ে তারা আগামী দিনের ভিত গড়েছে।

নগর সভ্যতা : উর্বর নদী উপত্যকাগুলোতে দ্রুত মানুষের ভিড় বেড়েছে। উর্বর মাটিতে মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত ফসল জীবনের মানকে উন্নত করতে সাহায্য করেছে। ফলে এসব অঞ্চলে খুব দ্রুত নগর, বন্দর গড়ে উঠেছে। মিশরের মেম্‌ফিস্‌ থিবস্‌, মেসোপটেমিয়ার উর, এরিডু, ব্যাবিলন, লাগাস, নিনেভে, ভারতের সিন্ধু উপত্যকার মহেনজোদরো, হরপ্পা প্রভৃতি নদীমাতৃক নাগরিক সভ্যতার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। এসব অঞ্চলের রোদে ও আগুনে পোড়া ইটের তৈরী ইমারতের নিদর্শন আজও মানুষকে বিস্মিত করে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা : প্রাচুর্য মানুষকে অনেক অবসর দেয় আর দেয় ভাবনা চিন্তার অবকাশ। তাই সেকালের এই সব অঞ্চলের মানুষের অনেকেই নানা রকম জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার অনেক অবকাশ পেত। এই চর্চা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে সেকালের লিখন পদ্ধতি, গ্রহ-নক্ষত্র ও ঋতু পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা, গণিত,

চিকিৎসা বিদ্যা ও শিল্প বোধ—এক কথায় আগামী দিনের উন্নত সভ্যতার অনেক উপাদান।

বাণিজ্যিক যোগাযোগ: জীবনের মানকে উন্নত করতে গিয়ে এ সব অঞ্চলের মানুষ নানা রকম চাহিদা মেটানোর জন্য অনেক ক্ষেত্রে দূর বিদেশের মুখাপেক্ষী হয়েছে। নদী উপত্যকাগুলোর সর্বত্র তামা, ব্রোন্‌জ, পাথর খুব সহজ লভ্য ছিল না। তাই বিদেশের সাথে বাণিজ্যিক বিনিময়ের মাধ্যমে তাদের এই সব সংগ্রহ করতে হত। স্থল ও জল উভয় পথেই বাণিজ্য চলত। নদীপথে নৌকা আর স্থলপথে ভারবাহী পশু হয়ে উঠেছিল যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রধান উপায়।

পুরোহিত শাসক: নদীমাতৃক সভ্যতায় সে যুগে শাসন ব্যবস্থা প্রধানত পুরোহিতদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হত। বিশেষ করে মেসোপটেমিয়ায় পুরোহিত শাসকই ছিলেন সর্বপ্রধান। মিশরে অবশ্য পুরোহিতদের উপরে আর একজন ছিলেন। তিনি ভগবান হোরাসের জীবন্ত অবতার—**'ফারাও'** দেবতারাজা। তবে মিশরের পুরোহিতরা ফারাওদের দৈব মহিমার গুণ-কীর্তন করে তাদের ক্ষমতাকে অপ্রতিহত করে তুলতে সাহায্য করতেন।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন: নদীমাতৃক সভ্যতায় মানুষের জীবন ছিল সূর্যকরোজ্জ্বল, পরিশ্রম বহুল, সরল ও অনাড়ম্বর। সমাজ যখন ক্রমশ বড় ও জটিল হয়ে উঠল তখন সমাজ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ল। উদ্বৃত্ত ফসল জমা হতে থাকল মুষ্টিমেয় লোকের হাতে। এই মুষ্টিমেয় লোকেরা খাদ্যের বিনিময়ে অপরকে দিয়ে পরিশ্রম সাধ্য কাজ করিয়ে নিত। এই ভাবে সমাজে ক্রীতদাস শ্রেণীর উদ্ভব হয়। সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য বৃদ্ধি পায়।

ধর্মজীবনও সমাজ জীবনের একটি অঙ্গ। নদী উপত্যকার সভ্যতায় প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে ও আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রকে দেব-দেবী রূপে কল্পনা করা হত। মৃত্যুর পরেও মানুষের পরলোকের জীবন আছে এ বিশ্বাস তাদের ছিল। তাই মৃতের সাথে জীবন ধারণের

উপযোগী খাদ্য পানীয় ও অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে তার সমাধি দেওয়া হত। মৃতদেহ বা দেহাবশেষ সংরক্ষণ করার প্রথাও প্রচলিত ছিল।

নদীমাতৃক সভ্যতার অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি ছিল কৃষি। কৃষির সাথে পশুপালন, মাছ ধরা ইত্যাদিও অর্থনৈতিক জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। ক্রমশ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও নতুন নতুন উদ্ভাবনী বুদ্ধির বিকাশের ফলে নানা রকম কারিগরি বিদ্যারও বিকাশ হয়। ধাতুশিল্প, মৃৎশিল্প থেকে শুরু করে বস্ত্র বয়ন, ইমারত নির্মাণ ইত্যাদি কাজকর্মের জন্য বিশেষ বৃত্তির উদ্ভব হয়। ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্য তখনও মুদ্রার প্রচলন হয়নি। কাজেই দ্রব্যের বিনিময়ে ক্রয় ও বিক্রয় চলত। দূর বিদেশের সাথেও ব্যবসা-বাণিজ্য বিনিময়ে চলত। বিভিন্ন মাপের ওজন, সীল মোহর ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যবহার করা হত।

অনুশীলনী

১। বিষয়মুখী ও মৌখিক প্রশ্ন ঃ

(ক) মেসোপটেমিয়া কোথায় অবস্থিত ? (খ) মেসোপটেমিয়াতে কারা প্রথম সভ্যতার পত্তন করেছিল ? (গ) সুমেরীয়ার সর্বপ্রাচীন শহর কি ? (ঘ) সুমেরীয়ার কয়েকটি বড় শহরের নাম কর। (ঙ) জিগ্‌গুরাত কি ? (চ) আক্কাদীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কে করেছিলেন ? (ছ) সুমেরীয়রা কি লিপিতে লিখত ? (জ) মিশর কোথায় অবস্থিত ? (ঝ) প্রাচীন মিশরের রাজাদের কি বলা হত ? (ঞ) মিশরের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ফারাওদের নাম কর। (ট) পিরামিড কি ? (ঠ) 'মমি' কি ? (ড) প্রাচীন মিশরীয়দের লিপিকে কি লিপি বলা হত ? (ঢ) প্যাপাইরাস কি ? (ণ) সিন্ধু-সভ্যতা কে আবিষ্কার করেন ? (ত) সিন্ধু সভ্যতার অবস্থান কোথায় ?

(থ) সিন্ধু সভ্যতার প্রধান কেন্দ্রগুলি কি কি? (দ) কত বছর আগে এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল? (ধ) কোন্ কোন্ সভ্যতার সাথে এই সভ্যতার যোগাযোগ ছিল? (ন) সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা কারা? (প) চীন দেশের কোথায় প্রথম সভ্যতার উন্মেষ হয়েছিল? (ফ) কত বছর আগে চীন দেশে সভ্যতার বিকাশ শুরু হয়েছিল? (ব) চীনে প্রথমে কোন্ রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়? (ভ) নদীমাতৃক সভ্যতার প্রধান জীবিকা কি?

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন :**

(ক) মেসোপটেমিয়ার অবস্থান ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কি জান? (খ) সুমেরীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব বিষয়ে কি জান? (গ) এই সভ্যতার অর্থনৈতিক জীবন কিরূপ ছিল? (ঘ) সুমেরীয় সভ্যতার ক্রীতদাস সমাজ কিরূপে গড়ে উঠেছিল? (ঙ) প্রাচীন সুমেরীয় রাজা ও পুরোহিতদের ভূমিকা কিরূপ ছিল? (চ) সুমেরীয়দের জ্ঞান চর্চার কি পরিচয় পাওয়া যায়? (ছ) সুমেরীয়দের ব্যবসা-বাণিজ্য কিরূপ ছিল? (জ) প্রাচীন সুমেরীয়দের জ্ঞান চর্চার বিষয় সম্বন্ধে কি জান? (ঝ) প্রাচীন মিশরের সভাতার উন্মেষ হয়েছিল কিভাবে? (ঞ) মিশরের পুরোহিতদের ভূমিকা কি ছিল? (ট) মিশরের পিরামিড কি ভাবে তৈরী হত? (ঠ) মিশরীয়রা কি ভাবে লেখার চর্চা করত? (ড) সিন্ধু সভ্যতা কি ভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিল? (ঢ) সিন্ধু সভাতার কি কি নিদর্শন পাওয়া যায়? (ণ) সিন্ধু সভ্যতার লোকেদের খাদ্য কি ছিল? (ত) সিন্ধু সভ্যতার ধর্ম বিশ্বাস কিরূপ ছিল? (থ) সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসের কারণ কি? (দ) সিন্ধু সভ্যতার লিপি সম্বন্ধে কি জান? (ধ) সিন্ধু সভ্যতায় সমাজের শ্রেণী বিন্যাস কিরূপ ছিল? (ন) সিন্ধু সভ্যতার গুরুত্ব কি? (প) ইয়াংসি-কিয়াং অঞ্চলে মানুষ প্রথম কি ভাবে জনপদ গড়ে তুলেছিল? (ফ) হোয়াং-হো কে চীনের দুঃখ বলা হত কেন? (ব) বন্যা সম্পর্কে চীনের একটি পৌরানিক কাহিনী নিজের ভাষায় বল। (ভ) নদীমাতৃক সভ্যতাগুলির নাম কর। (ম) নদীমাতৃক সভ্যতাগুলিতে নগর পত্তন কিভাবে হয়েছিল? (য) নদীমাতৃক সভ্যতাগুলির শাসন ব্যবস্থা কিরূপ ছিল? (র) নদীমাতৃক সভ্যতায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা কি ভাবে হয়েছিল? (ল) এই সভ্যতায় সমাজ জীবন কিরূপ ছিল? (ব) এই সভ্যতায় অর্থনৈতিক জীবন কিরূপ ছিল?

৩। **রচনা ভিত্তিক প্রশ্ন :**

১। মেসোপটেমীয় সভ্যতার উন্মেষ কি ভাবে হয়েছিল ?

২। সুমেরীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার উন্মেষ কি ভাবে হয়েছিল ?

৩। সভ্যতার ক্ষেত্রে সুমেরীয়দের অবদান কি ছিল ?

৪। সুমেরীয় লিপির বিকাশ সম্বন্ধে কি জান ?

৫। মিশরীয় ফারাওদের কথা কি জান ?

৬। প্রাচীন মিশরীয় জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন কিরূপ ছিল ?

৭। মিশরের পিরামিড সম্বন্ধে কি জান ?

৮। মিশরীয়দের ধর্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে কি জান ?

৯। প্রাচীন মিশরীয় লিপি সম্বন্ধে কি জান ?

১০। সিন্ধু সভ্যতার নগর পরিকল্পনা বিষয়ে কি জান ?

১১। প্রাপ্ত নিদর্শন থেকে সিন্ধু সভ্যতার লোকদের খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ ও অর্থ নৈতিক জীবন সম্পর্কে কি জানা যায় ?

১২। প্রাপ্ত নিদর্শন থেকে সিন্ধু সভ্যতার সমাজ ও ধর্ম জীবন সম্বন্ধে কি জানা যায় ?

১৩। প্রাচীন চীনের সভ্যতায় মানুষের জীবন যাত্রা কিরূপ ছিল ?

১৪। নদীমাতৃক সভ্যতাগুলিতে কি কি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় ?

পঞ্চম অধ্যায় | ১। লৌহ যুগ

আবিষ্কার ও ব্যবহার : পৃথিবীতে লোহার আবিষ্কার কবে হয়েছিল, এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের ধারণা খুব পরিষ্কার নয়। তবে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকের কোন এক সময়ে হয়ত লোহার আবিষ্কার হয়েছিল। অবশ্য তার আগে উল্কার লৌহ পিণ্ডের সাথে সুমেরীয়দের পরিচয় হয়েছিল। প্রকৃতি থেকে লৌহ আকরিক সংগ্রহ করে তা থেকে লোহা বের করার পদ্ধতি সম্ভবত যাযাবর জাতিই প্রথম উদ্ভাবন করেছিল। কর্ষিত ভূমির অধিবাসীদের চেয়ে খনিজ পদার্থের জ্ঞান যাযাবরদেরই বেশী ছিল। কারণ তাদের পার্বত্য পথ আর পাথুরে জায়গা দিয়ে যাতায়াত করতে হত। আদিম সভ্য দেশগুলো থেকে অনেক দূরে, মধ্য ইউরোপে খুব গোড়ার দিকে ধাতুপিণ্ড থেকে নিষ্কাশিত লোহার কিছু যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে।

লোহা আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন ধরণের হাতিয়ার লোহা দিয়ে তৈরী হতে লাগল। লোহার তৈরী তলোয়ার, বর্শা, কুঠার, লাঙ্গলের ফাল ইত্যাদি তামা, ব্রোন্‌জ নির্মিত হাতিয়ার অপেক্ষা অনেক বেশী শক্ত, মজবুত আর কার্যকারী হল। লোহা ক্রমশ তামা ও ব্রোন্‌জ থেকে অনেক সস্তা ও সহজ লভ্য হয়ে উঠল। কাজেই তামা ও ব্রোন্‌জের বদলে লোহার ব্যবহার দ্রুত প্রসার লাভ করল। পৃথিবীতে শুরু হল লৌহ যুগ।

সভ্যতায় লোহার প্রভাব : লোহার ব্যবহার মানব সভ্যতায় বিপ্লব আনল। লোহার নির্মিত লাঙ্গলের ফাল দিয়ে ভূমি কর্ষণ অনেক সুবিধাজনক হল। লোহার কুঠার ও অন্যান্য হাতিয়ার দিয়ে গাছ কেটে জঙ্গল কেটে কর্ষিত ভূমির পরিমাণ বাড়ান হল। ফলে উৎপাদকদের হাতে জমা হতে লাগল আরও পর্যাপ্ত পরিমাণ ফসল।

শাসকদের সরকারী গোলায় নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল রাজস্ব হিসাবে দিয়েও উৎপাদকের হাতে জমা হল প্রচুর উদ্বৃত্ত ফসল। এই উদ্বৃত্ত ফসলের বিনিময়ে তারা দ্রুত নিজেদের অবস্থার উন্নতি ঘটাল। মানুষের জীবন যাত্রার মান বাড়ল, নতুন নতুন চাহিদার সৃষ্টি হল সমাজে। ব্যবসা বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার ঘটল। নৌ-শিল্পের উন্নতি হল, মানুষের জীবন জীবিকার আরও নতুন নতুন দিক খুলে গেল। বাণিজ্যিক প্রসারের ফলে পুরনো বিনিময় ব্যবস্থায় নানা অসুবিধা দেখা দিল। বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে উন্নত কোন ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দিল। ফলে বিনিময়-মাধ্যম হিসাবে মুদ্রার প্রচলন হল। সোনা, রূপা ও তামার মুদ্রার প্রচলন ব্যবস্থা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা এনে দিল।

সামাজিক প্রভাবঃ লোহার ব্যবহার যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করল, তার প্রভাব এসে পড়ল সমাজ ব্যবস্থার উপরেও। সামাজে উৎপাদক ও মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়তে লাগল। শাসক ও রাজপুরুষদের একচেটে প্রতিপত্তি ভেঙে পড়ল। নতুন এই মুক্তির স্বাদ মানুষকে উদ্দীপিত করে তুলল।

রাজনৈতিক প্রভাবঃ অর্থনৈতিক ও সামাজিক এই পরিবর্তনে পুরানো সভ্যতার রাজশক্তিগুলো উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের উচ্চাকাঙ্খায় মেতে উঠল। আবার, ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে নতুন নতুন জাতিও এসে হাজির হল। লোহার হাতিয়ারে বলীয়ান হয়ে তারা প্রাচীন সভ্য জগতের উপর আধিপত্য স্থাপন করল এবং সভ্যতাকে তারা আরও সুদূর প্রসারী করে তুলল। পারসিক, গ্রীক, রোমান, ভারতে আর্য প্রভৃতি জাতির আবির্ভাব লৌহযুগের সূচনাতেই হয়েছিল।

শাসনতান্ত্রিক প্রভাবঃ লৌহযুগের যুগান্তকারী প্রভাব বিভিন্ন দেশের ব্যবস্থায় আনল বিরাট আলোড়ন। এতকালের পুরোহিত শাসকদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ভেঙে পড়ল। প্রাচীন

গ্রীসে স্বাধীন নাগরিকরা মিলে গড়ে তুলল **গণতান্ত্রিক শাসন** ব্যবস্থা। রোমে প্রতিষ্ঠিত হল কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তির মিলিত শাসন **'অলিগার্কি'**। আবার কোথাও কোথাও কোন দলপতি বা সমাজপতি বিপুল প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার অধিকারী হয়ে স্বাধীন **স্বৈরতন্ত্রের** প্রতিষ্ঠা করলেন।

(ক) ব্যাবিলন

প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার সাথে আগেই আমাদের পরিচয় হয়েছে। এই মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার একটি বড় প্রাণ কেন্দ্র হিসাবে এক সময় **ব্যাবিলন** খুব উন্নতি করেছিল।

দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার ইউফ্রেটিস নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল ব্যাবিলন শহর। প্রথমদিকে ব্যাবিলনের ঘর বাড়িগুলো তৈরী হত খড় আর কাদা মাটি দিয়ে। পরবর্তীকালে রোদে পোড়া ইট দিয়ে বাড়ি-ঘর তৈরী হত। ব্যাবিলনের চারদিকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল উর্বর জমি। সে সব জমিতে প্রচুর পরিমাণে গম ও বার্লির চাষ হত। খেজুরও উৎপন্ন হত খুব।

কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ প্রাচীনকালে ব্যাবিলন মস্ত এক বাণিজ্য কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। টাইগ্রীস নদীটাও ছিল ব্যাবিলনের কাছে। ইউফ্রেটিস আর টাইগ্রীস বেয়ে উত্তরের রাজ্যগুলো থেকে বড় বড় পণ্যবাহী নৌকা এসে ভিড়ত ব্যাবিলনের ঘাটে। দক্ষিণের রাজ্যগুলো থেকেও পণ্যবাহী নৌকা ব্যাবিলন হয়ে উত্তরদিকে যেত। সমগ্র মেসোপটেমিয়াতে যে বাণিজ্যিক স্থল পথ ছিল সেটাও গিয়েছিল ব্যাবিলনের উপর দিয়ে। কাজেই দূর দূরান্ত থেকে পণ্য বোঝাই উট আর গাধার মিছিল যাতায়াত করত ব্যাবিলনের উপর দিয়ে। এ সবের ফলে ব্যাবিলন খুব দ্রুত এক সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত হয়েছিল।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি ঃ ব্যাবিলনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি ছিল মন্দির

কেন্দ্রিক। কাদা মাটি দিয়ে তৈরী স্তরে স্তরে উপর দিকে উঠে যাওয়া মন্দিরগুলোকে **জিগগুরাত** বলা হত। এই জিগগুরাতের কথা আমরা আগেও বলেছি। এই সব মন্দিরের তত্ত্বধানের ভার থাকত পুরোহিতদের উপর। পুরোহিতরা এই সব মন্দিরের উঁচু শীর্ষে উঠে দেবতাদের উপাসনা করতেন আর আকাশের গ্রহ, নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করতেন। এই রকম একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ব্যাবিলনে আবিষ্কৃত হয়েছে। সেটা **'বেবেলের টাওয়ার'** নামে পরিচিত। ব্যাবিলনের পুরোহিতরা ছিলেন খুব মহিমময় ব্যক্তি। তাঁরা সর্বদা নানাবিধ জ্ঞান চর্চায় নিরত থাকতেন। কীলক লিপির সাহায্যে লিখন চর্চার বিকাশ সাধনে ব্যাবিলনের এই পুরোহিতদের অবদানই সব থেকে বেশী। ব্যাবিলনের ধ্বংসাবশেষ থেকে এই ধরণের সুমেরীয় লিপিতে লেখা অসংখ্য পোড়ামাটির টালি পাওয়া গেছে। সেই সব টালির লেখা পাঠোদ্ধার করে ব্যাবিলনীয়দের জ্ঞান চর্চার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহকে তারা দেবতা জ্ঞানে উপাসনা করত। সপ্তাহের এক একটা দিনকে তারা এই সব গ্রহ নক্ষত্রের নামে স্মরণ করত। আমরা যেমন একশত পর্যন্ত গণনা করি, তাদের গণনার হিসাব ছিল ষাট পর্যন্ত। সম্ভবত ষাট মিনিটে ঘণ্টার হিসাব আমরা ব্যাবিলনীয়দের কাছ থেকেই পেয়েছি। তাদের চিকিৎসা চর্চারও অনেক খবর পাওয়া গেছে পোড়া মাটির টালির এই সব গ্রন্থ থেকে।

রাজা হামুরাবি ঃ মেসোপটেমিয়ার আক্কাদীয় বংশের পতনের পর আবার দেশীয় আর একটি যাযাবর গোষ্ঠীর নেতা **হামুরাবি** ব্যাবিলন অধিকার করেন। রাজা হামুরাবির রাজত্বকাল শুরু হয় খ্রীষ্ট পূর্ব ১৭৯২ অব্দে। খ্রীষ্ট পূর্ব ১৭৫০ অব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। হামুরাবি এক বিরাট সৈন্য বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। সেই সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে তিনি সমগ্র মেসোপটেমিয়া এমন কি মেসোপটেমিয়ার বাইরেও বিভিন্ন অঞ্চলের উপর তাঁর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন।

খনন কার্যের ফলে সুমেরীয় লিপি খোদাই করা বড় একটা পাথরের ফলক পাওয়া গেছে। এই লিপির পাঠোদ্ধার করে জানা গেছে যে এটা রাজা হামুরাবির নির্দেশিত আইনের সংকলন। পাথর ফলকের উপরি ভাগে হামুরাবিকে সূর্যদেব ক্ষমতা দান করছেন—এই রকম চিত্র খোদাই করা আছে।

আইনের বিধান ঃ রাজা হামুরাবির যে আইনের বিধান রয়েছে, তাতে স্ত্রীজাতি, অনাথ ও দরিদ্রের প্রতি সুবিচারের নির্দেশ আছে। হামুরাবির আইনে চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত নেওয়ার বিধান রয়েছে। এমনও বিধান রয়েছে, যদি বাড়ি ভেঙ্গে পড়ে কোন গৃহস্থ বা তার পুত্রের মৃত্যু ঘটে তবে সেই বাড়ি নির্মাণকারীর শাস্তি হিসাবে তার নিজের জীবন বা তার পুত্রের জীবন দিতে হবে। হামুরাবির রাজত্বে চুরি করার শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। এমন কি কোন ব্যক্তি যদি কোন পলায়নপর ক্রীতদাসকে আশ্রয় দিয়ে লুকিয়ে রাখত, তবে তাকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত। ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে স্ত্রী, পুত্র, পরিবার সহ ঋণ দাতার দাসত্ব করতে হত। কোন অভিজাত ব্যক্তিতে কেউ আঘাত করলে তার শাস্তি ছিল ষাট ঘা চাবুক।

রাজা হামুরাবির এই সব বিধানগুলি প্রমাণ করে প্রাচীন সভ্যতার সে যুগে একমাত্র ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যেই একটা সুনির্দিষ্ট আইনের বিধি চালু ছিল। তবে হামুরাবির আইনের বিধানে সাধারণ দরিদ্র আর ক্রীতদাসদের উপর ধনী ও অভিজাতদের প্রধান্যই রক্ষিত হয়েছে।

সমাজ ঃ হামুরাবির আইনের বিধান থেকে সেকালের ব্যাবিলনের সমাজটা কেমন ছিল তার অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। অভিজাত, রাজ কর্মচারী, পুরোহিত, বণিক, সাধারণ মধ্যবিত্ত, কারিগর, দরিদ্র কৃষক ও ক্রীতদাস ইত্যাদি সম্প্রদায় বা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল।

হামুরাবির রাজত্বকালে ব্যাবিলন খুব শক্তিশালী হয়ে উঠলেও,

অবিরত যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে ব্যাবিলন শক্তি ক্ষয় করে খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। এরপর অপর একটি যাযাবর জাতির আক্রমণে হামুরাবির প্রতিষ্ঠিত ব্যাবলনীয় সাম্রাজ্যের পতন হয়।

(খ) মিশর সাম্রাজ্য

এর আগে আমরা প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার কিছুটা পরিচয় পেয়েছি। আমরা দেখেছি রাজা ফারাওদের অধীনে মিশর কি ভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। এবারে আমরা আলোচনা করব, পরবর্তীকালে মিশর আরও শক্তি সঞ্চয় করে কি ভাবে মিশরের বাহিরেও তার উপনিবেশ বিস্তার করেছিল।



ফারাও

খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দের মধ্যেই মিশর খুব সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছিল। জন সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে নানা রকম কারিগরি বিদ্যার উন্নতি হল এবং বাণিজ্যের আরও প্রসার ঘটল। ক্রমে ফারাওগণ বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে দিগ্‌বিজয়ের বাসনায় তাঁরা সৈন্যবল বাড়িয়ে তুললেন। কৃষকদের সৈন্য বাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করা হল। উন্নত ধরণের লৌহ নির্মিত অস্ত্র-শস্ত্র আর ঘোড়ায় টানা দুই চাকার রথে করে মিশরীয় বাহিনী যুদ্ধ করত। এ ছাড়া, অন্য দেশ থেকে ভাড়া করা সৈন্য এনেও মিশরীয় বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করা হত।

দ্বাদশ রাজবংশের পর মিশরে দীর্ঘদিন গৃহ বিবাদ ও অরাজকতা চলে। এরপর মধ্য এশিয়া থেকে **'হিক্‌সস্'** নামে এক মেষপালক জাতি মিশরে রাজত্ব করেন। এই হিক্‌সস্‌রা মিশরে ঘোড়া আর রথের প্রচলন করেন। অষ্টাদশ রাজ বংশের প্রথম ফারাও প্রথম **আহ্‌মেশ** মিশর থেকে হিকসস্‌দের বিতাড়িত করেন। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ ফারাও **তৃতীয় থোথমেশকে 'মিশরের নেপোলিয়ন'** বলা হত। খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে মিশরীয় বাহিনী ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী প্যালেস্টাইন এবং সিরিয়া অভিযান করেন। ফারাও তৃতীয় থোথমেস স্বর্ণখচিত রথে চড়ে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে এই অভিযান পরিচালনা করেন। প্যালেস্টাইন এবং সিরিয়ার বাহিনী মরণ পণ প্রতিরোধ সংগ্রাম করেও মিশরীয় বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়। মিশরীয়রা এই দুই দেশের গ্রাম ও নগর ভস্মীভূত করে, ক্ষেত খামার ধ্বংস করে, বিজিত দেশের সমস্ত মানুষকে ধরে এনে ক্রীতদাসে পরিণত করে। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পর তৃতীয় থোথমেস ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী ব্যপক অঞ্চল জুড়ে মিশরের প্রাধান্য ও প্রভুত্ব বিস্তার করেন। এইভাবে মিশরীয় সাম্রাজ্যের ক্ষমতা ইউফ্রেটিস নদীর তীরবর্তী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। শুধু স্থল যুদ্ধই নয়, নৌ-যুদ্ধেও তৃতীয় থোথমেস বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন। **সাইপ্রাস ও ক্রীট দ্বীপের** অধিপতিগণ তাকে কর দিতেন। মেসোপটেমিয়ার রাজারাও তাঁর বন্ধুত্ব লাভের আশায় তাকে মূল্যবান উপঢৌকন পাঠাতেন।

ঊনবিংশ রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ ফারাও **দ্বিতীয় রামেসিজকে** 'মহামতি রামেসিজ' বলা হয়। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ যোগ্য এবং সৌধ নির্মাতা হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। পশ্চিম এশিয়ার জাতিগুলির বিদ্রোহ দমন করার জন্য তিনি বহু অভিযান চালিয়ে ছিলেন কিন্তু তৃতীয় থোথমেসের বিশাল সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁর পরেই মিশরের পতনের যুগ শুরু হয়।

মিশরের ফারাওগণ বিজিত দেশের ধনসম্পদ আহরণ করে সোনা, ব্রোন্‌জ, হাতির দাঁত, মূল্যবান কাঠ ইত্যাদি দিয়ে তাদের

ধনাগার ভরে তুলেছিলেন। লক্ষ লক্ষ পরাজিত বন্দীকে ধরে এনে ক্রীতদাসে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। যুদ্ধে লুন্ঠিত সম্পদের একটা বড় অংশ অভিজাত এবং পুরোহিতদের হাতেও পড়েছিল। তাদের অধীনে ক্রীতদাসদের সংখ্যাও অনেক বেড়ে উঠেছিল। ফলে শেষ দিকে সমাজে ধনী দরিদ্রের বৈষম্যও অনেক ব্যাপক হয়ে পড়েছিল।

মিশরীয় সাম্রাজ্যের পতন ঃ উনবিংশ রাজবংশের পর মিশরীয় সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। বিজিত দেশে ক্রমাগত বিদ্রোহ দেখা দিল। বিদ্রোহ দমনের জন্য ফারাওগণ ক্রমশ সম্পদ ও শক্তি ক্ষয় করতে লাগলেন। কৃষকদের জোর করে সৈন্য বাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করা হল। কৃষির অবস্থাও ক্রমশ খারাপ হয়ে পড়ল। মিশরে দেখা দিল চরম সঙ্কট। সাধারণ দরিদ্র মানুষ, কৃষক ও কারিগরগণ ফারাও এবং অভিজাত রাজপুরুষ ও পুরোহিতদের প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠল। দেশের অভ্যন্তরে দেখা দিতে লাগল ঘন ঘন বিদ্রোহ। ক্রীতদাসদের বিদ্রোহত লেগেই ছিল। মিশরের এই সঙ্কটের দিনে প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে এল আক্রমণের ঢেউ। শেষ পর্যন্ত প্রতিবেশীদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও আর ফারাওদের রইল না। অবশেষে খ্রীষ্টপূর্ব ৫২৫ অব্দে **পারসিক** আক্রমণে মিশরের পতন হল। সমগ্র মিশর পারস্যের পদানত হল। এর পরবর্তীকালে **গ্রীস** এবং তারও পরে **রোম** মিশরের উপর আধিপত্য স্থাপন করেছিল।

মিশরের পুরোহিত সম্প্রদায়ঃ মিশরের পুরোহিতদের কথা আমরা আগেও আলোচনা করেছি। এই পুরোহিতরা প্রথম দিকে খুব মহিমময় ছিলেন। তাঁরা নানা রকম জ্ঞান চর্চায় নিরত থাকতেন। তাঁরা মিশরীয়দের নানা রকম জটিল প্রশ্নের উত্তর দিতেন। তাঁদের উপর নানাবিধ বিষয়ের লিখিত বিবরণ রাখার দায়িত্ব ছিল। মিশরীয় 'হিরোগ্লিফিক' লিপির চর্চায় এবং তার বিকাশ সাধনে পুরোহিতদের অবদানই ছিল সব থেকে বেশী।

এই পুরোহিতরা সত্যিই খুব জ্ঞানী ও গুণী ছিলেন। তাই সকলেই তাঁদের খুব সমীহ করে চলত।

কিন্তু পরবর্তীকালে এই পুরোহিত সম্প্রদায় খুব ভোগ বিলাসী হয়ে পড়েন। যেহেতু দেবতাদের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদন করতে হত পুরোহিতদের মাধ্যমে, তাই অর্ঘ্যের সমস্ত সামগ্রী জমা হত পুরোহিতদের হাতে। মিশরের ফারাওগণ যুদ্ধে জয়লাভ করার পর লুণ্ঠিত সম্পদ এবং যুদ্ধ বন্দী অগণিত ক্রীতদাসের একটা অংশ দেবতার অর্ঘ্য হিসাবে পুরোহিতদের হাতে জমা দিতেন। অর্ঘ্য হিসাবে দরিদ্র কৃষকদের দেওয়া শস্য থেকে আরম্ভ করে অভিজাত ধনী ব্যক্তিদের দেওয়া বিপুল ধন সম্পদ সবই পুরোহিতদের হাতে পড়ত। এইভাবে বিপুল ধন সম্পদের অধিকারী হয়ে পুরোহিতরা খুব প্রতিপত্তিশালী ও ভোগ বিলাসী হয়ে উঠেছিলেন। মিশরের সঙ্কটের দিনে বিদেশীদের আক্রমণ শুরু হলে অভিজাত রাজ-কর্মচারীদের মত পুরোহিতরাও অনায়াসে আক্রমণকারীদের পক্ষে যোগ দিতেন। পুরোহিতদের উপর সাধারণের শ্রদ্ধা অনেককাল আগেই তিরোহিত হয়েছিল।

(গ) ইরাণ

পারসিক শক্তির বিকাশঃ প্রাচীন মেসোপটেমিয়া আর মিশর প্রায় তিন হাজার বছর ধরে সভ্যতার প্রদীপ জ্বেলে রেখেছিল। তারপর সে প্রদীপ এক সময় ম্লান হয়ে এল। এরপর প্রচুর প্রাণ শক্তিতে ভরপুর নতুন আর একটি উদ্যমশীল জাতি ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাড়াল মধ্য এশিয়ায়। এরা ইন্দো-ইউরোপীয় মেষপালক গোষ্ঠীর একটি শাখা। এরা নিজেদের আদি বাসভূমি কাস্পিয়ান-সাগর তীরবর্তী অঞ্চল থেকে গোচারণ ভূমির সন্ধানে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এঁদের কয়েকটি শাখা যায় ইউরোপের দিকে আর কয়েকটি শাখা আসে মধ্যএশিয়ায়। এঁদেরই আর একটি শাখা,

পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে আর্য সভ্যতার পত্তন করেছিল। মধ্য-এশিয়ায় যারা এল, তারা প্রথমে ইরাণের মালভূমির পাহাড়ী এলাকায় মেষপালকের রাখালিয়া জীবন যাপন করতে শুরু করে। এদের মধ্যে আবার প্রধান দুটি গোষ্ঠী মেডেস এবং পারস্যে বসবাস করেছিল। পরবর্তীকালে **সাইরাস** নামে একজন দলপতি পারসিকদের রাজা হয়ে বসেন। এই সাইরাসের পরবর্তী বংশধরেরাই এক সময় সমগ্র পশ্চিমএশিয়া, মিশর এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বিশাল পারস্য সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন।

জরথুষ্ট্র ও তাঁর ধর্ম ঃ ইরাণীরা নিরন্তর গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব ও কঠিন জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিপুল অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ১২০০ বছর আগে ইরাণীদের ধর্মগুরু **জরথুষ্ট্র** আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি ইরাণীদের এক ধর্মীয় বন্ধনে আবদ্ধ করেন। জরথুষ্ট্রের ধর্মের সার কথা হল, জগতে নিরন্তর ভাল ও মন্দ এবং আলো ও অন্ধকারের মধ্যে লড়াই চলেছে। ভাল ও আলোর দেবতা হলেন **'আহুরমাজদা'** এবং মন্দ ও অন্ধকারের অপদেবতা হল **'আহ্রিমান'**। তিনি বললেন, এই দুই শক্তির লড়াইতে ভালর দেবতা 'আহুরমাজদারই' জয় হবে। তাই ইরাণীদের উপাস্য দেবতা 'আহুরমাজদা'। জরথুষ্ট্রের অনুগামীরা আহুরমাজদার প্রতীক হিসাবে অগ্নির উপাসনা করতেন। তাই তারা অগ্নির উপাসক হিসাবেও পরিচিত। সম্ভবত ইরাণীদের এই অগ্নির উপাসনা ভারতে আর্যদের মাধ্যমে হিন্দুদেরও প্রভাবিত করেছিল। ভারতের হিন্দুরাও পূজা-পার্বনে হোম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

ইরাণীদের ধর্ম গ্রন্থের নাম **'আবেস্ত'** বা **'জেন্দাবেস্ত'**। জেন্দা-বেস্ত-এর মূল কথা হল, সৎচিন্তা, সৎবাক্য এবং সৎকর্ম। জরথুষ্ট্র তাঁর শিষ্যদের শিখিয়ে ছিলেন ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়।

পরবর্তীকালে মুসলমান ধর্মের আবির্ভাব ঘটলে, এই অগ্নির উপাসকরা মুসলমানদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য ভারতে চলে আসে। পারস্য দেশ থেকে তারা এসেছিল বলে ভারতে এরা পার্সী নামে পরিচিত।

(ঘ) ইহুদী

ইহুদীদের আদি পরিচয়ঃ খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় তুহাজার বছর পূর্বে সেমেটিক জাতির মেষপালক রাখালিয়া সম্প্রদায়ের একটি শাখা চারণভূমির সন্ধানে তাদের আদি বাসভূমি ইউফ্রেটিস নদী-মোহনার উর অঞ্চল ছেড়ে ব্যাবিলন রাজ্যের মধ্যে কোন অঞ্চলে এসে বসবাসের চেষ্টা করছিল। কিন্তু ব্যাবিলনীয়ার রাজপুরুষেরা সেখান থেকে তাদের বিতারিত করলে তারা আরও পশ্চিমদিকে সরে যায়। তারপর তারা এক মুক্ত অঞ্চলের সন্ধান পায় এবং সেখানে বসবাস শুরু করে। এই রাখালিয়া সম্প্রদায়টি ইতিহাসে '**ইহুদী**' নামে পরিচিত।

ইতিহাসে ইহুদীদের গুরুত্বঃ ইহুদীরা তাদের আদি পূর্বপুরুষ **আব্রাহামের** সন্তান সন্ততি বলে নিজেদের মনে করে। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহুদীদের গুরুত্ব এই জন্য যে তারা একটা লিপিবদ্ধ সাহিত্যের সৃষ্টি করেছিল। পৃথিবীর একটা ইতিহাস, আইন, স্তোত্র ও জ্ঞানের বই, কবিতা, গল্প আর রাজনৈতিক উক্তি সমূহের একটা সংগ্রহই—যাকে '**ওল্ড টেষ্টামেণ্ট**' বলে, এ সবই ইহুদীরা সৃষ্টি করেছিল। খ্রীষ্টধর্মের প্রবর্তক যীশুখ্রীষ্ট এবং তারও পরে ইসলাম-ধর্মের প্রবর্তক **হজরত মহম্মদ** তুজনেই ইহুদী সম্প্রদায় থেকে এসেছিলেন।

ইহুদীরা পশ্চিমএশিয়ায় যেখানে বসবাস করছিল, সেখান থেকেও এক সময় বিতাড়িত হয়ে বহু দূর দূরান্ত পরিক্রমণ করে শেষ পর্যন্ত মিশরে এসে আশ্রয় লাভ করেছিল। হিকসস্‌রা যখন মিশরে আধিপত্য বিস্তার করে রাজত্ব করছিল তখনও ইহুদীরা তাদের গোচারণ ভূমিগুলিতে নিরোপদ্রবেই বসবাস করছিল। কিন্তু সুদীর্ঘ স্বাধীনতা লড়াই শেষে মিশরীয়রা যখন হিকসস্‌দের মিশর থেকে বিতাড়িত করল তখন থেকে আবার ইহুদীদের তুর্দিন শুরু হল। মিশরীয়রা ইহুদীদের ক্রীতদাসে পরিণত করল। আবার বহুকাল ধরে চলল ইহুদীদের তুর্বিসহ ক্রীতদাসের জীবন।

মুক্তিদাতা মুশা ঃ অবশেষে ইহুদীদের মধ্যে আবির্ভূত হলেন এক তরুণ। তাঁর নাম 'মোজেস' বা 'মুশা'। এই মুশাই তাদের মুক্তির পথ দেখালেন।

সুদীর্ঘ মরুবাস এবং কষ্টসাধ্য জীবন-যাপনের মধ্য দিয়ে মুশা তার পূর্বপুরুষদের সরল অনাড়ম্বর জীবনের গুণগুলি আয়ত্ব করেছিলেন। স্বজাতির প্রতি গভীর মমত্ববোধে এবং তাদের মুক্তি কামনায় তাঁর প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছিল। একদিন মুশা তাঁর স্বজাতিদের নিয়ে মিশরের সীমান্তরক্ষীদের ফাঁকি দিয়ে মিশর থেকে পালিয়ে এলেন **সিনাই** পর্বতের পাদদেশে। সুদীর্ঘ মরুবাসের নিঃসঙ্গ জীবন-যাপনের মধ্য দিয়ে মুশা একদিন উপলব্ধি করলেন আকাশের বজ্র, বিদ্যুৎ আর ঝড়-ঝঞ্ঝার অসীম শক্তির কথা ; মেষ-পালকদের জীবনে এর অসীম প্রভাবের কথা। সেকালের এশিয়ার উপাস্য বহু দেব-দেবীর মধ্যে আকাশের বজ্র, বিদ্যুৎ আর ঝড়-ঝঞ্ঝার দেবতা **'জিহোভা'** সেদিন থেকে হয়ে উঠলেন ইহুদীদের একমাত্র উপাস্য দেবতা।

একদিন মুশা তাঁর প্রিয়জনদের কাছ থেকে অন্তর্ধান হলেন। সকলে লক্ষ্য করল নিকটবর্তী পর্বতের শিখরদেশ ঘন অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। তারপর প্রচণ্ড বজ্র, বিদ্যুৎ সহ ঝড় উঠল। মুশা আবার ফিরে এলেন হাতে দুই খণ্ড পাথরের ফলক নিয়ে। ফলক দুটির উপর খোদিত রয়েছে ভগবান জিহোভার দশটি বাণী।* জিহোভা নির্দেশিত এই দশটি বাণী ইতিহাসে **'টেনকম্যাণ্ডমেণ্টস'** নামে পরিচিত।

এরপর মুশা তাঁর স্বজাতিদের নিয়ে আবার যাত্রা শুরু করলেন মরুভূমির পথে। বহু বছরের পরিক্রমার পর তাদের তিনি নিয়ে এলেন একটি মনোরম স্থানে। এই স্থানটির নাম **'প্যালেসটাইন'**। কিন্তু এখানে **'কনান'** নামে সেমেটিক জাতির অপর একটি শাখা আগে থেকেই বসবাস করছিল। কনানদের সাথে নবাগত ইহুদীদের বিরোধ বাঁধল। শেষ পর্যন্ত ইহুদীরা প্যালেসটাইনের উপত্যকা

অঞ্চলে বসতি স্থাপন করতে সক্ষম হল। ইহুদীরা সেখানে গড়ে তুলল কয়েকটি নগর। একটি নগরে নির্মিত হল তাদের জিহোভার এক বিরাট মন্দির। এই নগরটির নাম রাখা হল 'জেরুজালেম'। ইহুদীদের ভাষা **'হিব্রু'** হিব্রু ভাষায় জেরুজালেম কথার অর্থ হল 'শান্তির নীড়'।

ভগবান জিহোভার বিশ্বস্ত সেবক মুশা তার জীবন ব্যাপী কঠোর পরিশ্রম করে তাঁর উপাস্য দেবতাকে তুষ্ট করলেন। তাঁর স্বজাতিকে এক মনোরম পাহাড়ী উপত্যকার সন্ধান দিয়েই তিনি ক্লান্তিতে চিরদিনের মত চোখ বুজলেন। তিনি কেবল তাঁর স্বজাতিকে হীন দাসত্বের জীবন থেকে মুক্তিই দেননি, তিনি স্বজাতিকে বহু দেবতার বদলে একজন দেবতাকেই উপাসনা করতে শিখিয়েছিলেন।

অনুশীলনী

১। বিষয়মুখী ও মৌখিক প্রশ্ন :

(ক) লোহার আবিষ্কার কবে হয়েছিল? (খ) লোহার আবিষ্কার কারা করেছিল? (গ) সুমেরীয়রা লোহার সাথে কিভাবে পরিচিত ছিল? (ঘ) লোহা দিয়ে কি কি জিনিস তৈরী হত? (ঙ) লৌহ যুগে কোন কোন নতুন জাতি বড় হল? (চ) ব্যাবিলন কোথায় অবস্থিত? (ছ) 'বেবেলের' টাওয়ার কি এবং কোথায়? (জ) হামুরাবি কে? (ঝ) হামুরাবি কোন সময় রাজত্ব করেন? (ঞ) কাদের আক্রমণে ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের পতন হয়? (ট) হিক্‌সস কারা? (ঠ) মিশরের নেপোলিয়ন কাকে বলা হয়? (ড) কাদের আক্রমণে মিশরের পতন হয়? (ঢ) মিশরের পুরোহিতদের প্রধান অবদান কি? (ণ) ইরাণীরা কোথা থেকে এসেছিল? (ত) পারসিকদের প্রথম রাজা কে? (থ) ইরাণীদের ধর্মগুরু কে? (দ) ইরাণীদের দেবতা ও অপদেবতার নাম কি? (ধ) ইরাণীদের ধর্মগ্রন্থের নাম কি? (ন) পার্সী কাদের বলা হয়? (প) ইহুদীরা কোন জাতির লোক? (ফ) ইহুদীদের আদি পূর্ব পুরুষ কে? (ব) ইহুদীদের মুক্তির পথ কে দেখালেন? (ভ) জিহোভা কে? (ম) 'ওল্ড টেষ্টামেণ্ট' কাদের সৃষ্টি? (য) টেনকম্যাণ্ডমেণ্টস' কি? (র) মুক্তির পর ইহুদীরা কোথায় বসবাস শুরু করল?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন :

(ক) লোহার আবিষ্কার সম্বন্ধে কি জান? (খ) লোহার ব্যবহার দ্রুত প্রসার লাভ করল কেন? (গ) লোহার ব্যবহার উৎপাদনে কি পরিবর্তন আনল? (ঘ) লোহার সামাজিক প্রভাব কি? (ঙ) লৌহ যুগের প্রভাব শাসন ব্যবস্থায় কি পরিবর্তন আনল? (চ) ব্যাবিলন কি ভাবে মস্ত বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত হল? (ছ) শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চায় জিগগুরাতের ভূমিকা কি? (জ) রাজা হামুরাবির আইনের বিধান কিরূপ ছিল? (ঝ) হামুরাবির শাসনকালে ব্যাবিলনীয় সমাজ কিরূপ ছিল? (ঞ) ফারাও তৃতীয় থোথমেসের সাম্রাজ্য বিস্তারের বিবরণ দাও। (ট) দ্বিতীয় রামেসিস সম্পর্কে কি জান? (ঠ) মিশরীয় সাম্রাজ্যের পতন হয় কি ভাবে। (ড) মিশরের পুরোহিতরা মানুষের শ্রদ্ধা হারাল কেন? (ঢ) জরথুষ্ট্রের ধর্মের সার কথা কি? (ণ) পার্সীরা ভারতে চলে আসে কেন? (ত) ইহুদীদের আদি পরিচয় কি? (থ) ইতিহাসে ইহুদীদের গুরুত্ব কি? (দ) ভগবান জিহোভার দশটি বাণীকে কি বলা হয়? তা কিভাবে পাওয়া যায়? (ধ) মূশা ইহুদীদের কি দিয়েছিলেন?

৩। রচনা ভিত্তিক প্রশ্ন :

(ক) মানব সভ্যতায় লোহার প্রভাব কি? (খ) ব্যাবিলনীয়দের অর্থ-নৈতিক জীবন সম্বন্ধে কি জান? (গ) ব্যাবিলনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে কি জান? (ঘ) মিশর সাম্রাজ্য কি ভাবে বড় হয়েছিল? (ঙ) রাজা হামুরাবির শাসন প্রণালী সম্বন্ধে কি জান? (চ) মিশরের পুরোহিতদের ভূমিকা কি ছিল? (ছ) জরথুষ্ট্র ও তাঁর ধর্মমত সম্বন্ধে কি জান? (জ) মূশা ইহুদীদের কি ভাবে মুক্তি দেন?

২। গ্রীস

অবস্থান ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য : ইউরোপের বলকান উপদ্বীপের দক্ষিণে গ্রীসের অবস্থান। গ্রীসের তিনদিক সমুদ্র বেষ্টিত। দেশের অভ্যন্তর ভাগ যেমন পর্বত সঙ্কুল, উপকূলরেখা তেমনি ভগ্ন। এই ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য গ্রীসের

ইতিহাসকে স্বতন্ত্র রূপ দিয়েছে। গ্রীকদের জাতীয় অনৈক্য, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, গণতন্ত্র প্রীতি, সমুদ্র বিলাস, উপনিবেশ বিস্তার, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সৌন্দর্য প্রীতি—সব কিছুই তারা প্রকৃতির কাছ থেকে পেয়েছে।



ক্রীট সভ্যতা
স্কেল ৬০ ০ ৬০ কি.মি.

ক্রীট সভ্যতা: গ্রীকরা সুসভ্য জাতি হিসাবে গড়ে ওঠার অনেক আগে, খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় তিন হাজার বছর আগে গ্রীসের পূর্বদিকে ঈজিয়ান সাগরের বুকে অবস্থিত অসংখ্য দ্বীপগুলিতে অতি উচ্চমানের এক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এই সভ্যতা যারা গড়ে তুলেছিল তারা সভ্যতার ইন্ধন নিয়ে এসেছিল প্রাচীন সুমেরীয় ও মিশরীয়দের কাছ থেকে। আর এই সভ্যতার মধ্যমণি ছিল ক্রীট-দ্বীপ। তাই এই সভ্যতাকে বলা হয় ক্রীটসভ্যতা। ক্রীটে অবস্থিত নসোস্‌কে কেন্দ্র করে সেকালে ঈজিয়ানসাগরের বিভিন্ন দ্বীপে এক বিশাল উপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল।

নৌ-বাণিজ্যে ক্রীটবাসী ছিল খুব পারদর্শী। তাই ক্রীটসভ্যতার প্রভাব অতি সহজেই বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। এশিয়া মাইনরের বিখ্যাত ট্রয় নগরী এই সভ্যতার মস্ত কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। ঈজিয়ান অঞ্চলে এই সভ্যতার গৌরব প্রায় এক হাজার বছর টিকে ছিল।

ক্রীটের নসোস্-এর ধ্বংসাবশেষ থেকে যে সব নিদর্শন পাওয়া যায় তা থেকে অনুমান করা হয়, সে যুগের ক্রীটবাসী তামা ও ব্রোন্জের ব্যবহার শিখেছিল। তারা সুদৃঢ় ইমারত তৈরী করতে পারত। ক্রীটের রাজা **মিনোস**-এর রাজ-প্রাসাদ অত্যন্ত সুদৃশ্য ছিল। প্রাসাদের দরবার কক্ষ, ভূ-গর্ভস্থ বিশাল শস্যাগার, ঘোরানসিঁড়ি, জল নিকাষী ব্যবস্থা ইত্যাদি সেকালের তুলনায় খুবই বিস্ময়কর ছিল। সম্ভবত ক্রীটবাসীই প্রথমে বাথটাব বা স্নান পাত্রের ব্যবহার শিখেছিল। সেকালে ক্রীটবাসী ধাতু ও কারুশিল্পে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছিল। চিত্রাঙ্কন বিদ্যাতেও তাদের অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। তাদের হাতের লেখা দলিল-পত্র থেকে প্রমাণিত হয় ক্রীটবাসী লিখতে পড়তে জানত।

গ্রীকদের আদি পরিচয়ঃ প্রাচীন গ্রীকরা ক্রীটবাসীর তুলনায় অনেক অনুন্নত ছিল। ক্রীটবাসীর কাছ থেকেই তারা নগর নির্মাণ কৌশল, নৌ-বিদ্যা এবং সভ্যতার আরও অনেক উপাদান গ্রহণ করে নিজেদের উন্নত করেছিল। খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে এরা এসেছিল বলকান রাজ্যের উত্তরে দানিয়ুব নদীর তীরবর্তী অঞ্চল থেকে। এরা ছিল আর্য ভাষা গোষ্ঠীর মানুষ। কালক্রমে এরা উন্নত ক্রীটসভ্যতার সংস্পর্শে এসে অনেক উন্নত হয় এবং ঈজিয়ানসাগর অঞ্চলে নিজেদের প্রভুত্ব স্থাপন করে। সম্ভবত এই গ্রীকদের আক্রমণের ফলেই ক্রীটের নসোস্‌নগর ধ্বংস হয়েছিল। এই গ্রীকরা তাদের আদি পূর্বপুরুষ **হেলেন**-এর বংশধর বলে নিজেদের পরিচয় দিত, আর তাই তারা নিজেদের বলত **হেলেনিজ** ও নিজেদের বাসভূমির নাম দিয়েছিল **হেলাস**।

হোমারের যুগ : গ্রীসের সু-প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগ সম্বন্ধে নানা রকম কিংবদন্তী ও জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। কিন্তু সে সব নিয়ে কোন ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। পরবর্তীকালে **হোমার** নামে একজন অন্ধ কবি **ইলিয়ড ও ওডেসি** নামে দুখানি মহাকাব্য রচনা করেন। ভারতীয়দের কাছে যেমন রামায়ণ ও মহাভারত, গ্রীকদের কাছে তেমনি ইলিয়ড ও ওডেসি খুব আদরের বস্তু। মহাকবি হোমার রচিত মহাকাব্য দুখানি থেকে আমরা প্রাচীন গ্রীস সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য জানতে পারি। তাই হোমার বর্ণিত যুগকে **হোমারের যুগ** বা **মহাকাব্যের যুগ** বলা হয়।

নাগরিক সভ্যতা : হোমার বর্ণিত যুগের গ্রীকরা ছিল বর্বর। তারা লোহার ব্যবহার জানত না, লিখতে পারত না, এমনকি তখনও পর্যন্ত তারা নগরে বাস করত না। তারা গ্রামে বাস করত তাদের সর্দারদের চারপাশে কুঁড়েঘরগুলো ছড়ানো থাকত। তার পরে তারা বিজিত ঈজিয়ানদের কাছ থেকে নগর তৈরী করতে শিখল। আদিম গ্রীকদের নগরগুলো কোন না কোন উপজাতীয় দেবতার বেদীকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল। প্রাচীরটা তাতে পরে যোগ করা হয়েছিল।

শাসন ব্যবস্থা : সে যুগে গ্রীস দেশ অনেকগুলি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। এই সব রাষ্ট্রে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। তবে রাজার ক্ষমতা **বাউলি** নামক সমিতি আর **এগোরা** নামক জনসভা দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন : সমাজের ভিত্তি ছিল পরিবার। গৃহ কর্তাকে পরিবারের সকলে মেনে চলত। পরিবারের সমস্ত সম্পত্তির উপর সকলেরই ছিল সমান অধিকার। এই যুগের সমাজ চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—অভিজাত, স্বাধীন নাগরিক, শ্রমজীবী ও ক্রীতদাস। কৃষি, পশুপালন আর কারিগরি কাজ ছিল তাদের অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি।

নগর-রাষ্ট্র ঃ পৌরাণিক যুগের শেষের দিকে খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর মধ্যেই গ্রীসের পাহাড়ী উপত্যকা আর দ্বীপগুলোতে নতুন নতুন নগর গড়ে উঠল। **এথেন্স, স্পার্টা, করিন্থ, থিবস, স্যামোস, মিলেটাস** প্রভৃতি ছিল তাদের মধ্যে প্রধান। এই গ্রীক নগরগুলি বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জ ও পাহাড়ী উপত্যকায় পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। প্রাকৃতিক কারণে তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। ফলে তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় নি। ভৌগোলিক পরিস্থিতি গ্রীস নগর-রাষ্ট্রগুলিকে বড় হতে দেয় নি।

সাংস্কৃতিক ঐক্য ঃ রাষ্ট্রনৈতিক ভাবে গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ঐক্য না থাকলেও সংস্কৃতিগত ভাবে তাদের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব-বোধ গড়ে উঠেছিল। গ্রীকরা সকলেই নিজেদের হেলেন নামে এক পূর্ব পুরুষের বংশধর বলে মনে করত। তারা এক ভাষায় কথা বলত আর হোমার রচিত ইলিয়ড ও ওডেসি সকল গ্রীকদের কাছেই ছিল পরম আদরের বস্তু। তাদের প্রাচীন সাহিত্য ও উপাখ্যানের বিষয়বস্তু হোমার রচিত মহাকাব্য দুটো থেকেই সংগৃহীত হয়েছিল। এ ছাড়া প্রতি চার বছর অন্তর অলিম্পিয়া পাহাড়ের চূড়ায় গ্রীকরা এক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করত। এই অনুষ্ঠানে সকল গ্রীক রাষ্ট্র যোগ দিত। এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা থেকেই বর্তমান **অলিম্পিক** ক্রীড়ানুষ্ঠানের উদ্ভব হয়েছে। এই সব বিষয় গ্রীকদের মধ্যে এক সমাজগত অনুভূতি ও ঐক্য চেতনা জাগ্রত করেছিল। এ ছাড়া বাণিজ্যিক প্রয়োজন ও উপনিবেশ বিস্তারের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েও বিভিন্ন গ্রীক নগর-রাষ্ট্র পরস্পরের সাথে একাত্ম হয়ে উঠেছিল।

গ্রীক উপনিবেশ ঃ প্রাচীনকাল থেকেই গ্রীকজাতি ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী নানা স্থানে বসতি স্থাপন করে উপনিবেশ বিস্তারে প্রয়াসী হয়। বিভিন্ন উপজাতির আক্রমণের ফলে পূর্বতন অধিবাসীরা তাদের বাসভূমি ছেড়ে ঈজিয়ান দ্বীপপুঞ্জের দ্বীপগুলিতে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলিতে অভিজাতদের

প্রাধান্য স্থাপিত হলে দরিদ্র জনসাধারণ সবরকম অধিকার হারায়। তখন তারা স্বাধীনভাবে বসবাস করার জন্য নতুন নতুন দেশে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলেও দেশের বাইরে উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়োজন হয়। শিল্পের উন্নতি হলে, শিল্পজাত পণ্য সামগ্রী বিক্রি করার জন্যেও উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া অজানাকে জানার সুতীব্র আকাঙ্খাও গ্রীক জাতিকে উপনিবেশ বিস্তারে প্রয়াসী করেছিল।

গ্রীসের উপনিবেশগুলি ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপগুলিতে, এশিয়া মাইনর, ইটালি, মিশর প্রভৃতি দেশের উপকূল ভাগ দিয়ে গড়ে উঠেছিল। এই উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা ভোগ করলেও মাতৃভূমির সাথে তাদের যথেষ্ট সুসম্পর্ক ছিল।

এথেন্স ও স্পার্টা

ভৌগোলিক দিক দিয়ে গ্রীস তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল, উত্তর মধ্য ও দক্ষিণ গ্রীস। প্রথম দিকে মধ্য গ্রীসের **এথেন্স** ও দক্ষিণ গ্রীসের **স্পার্টা** খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে উত্তর গ্রীসের **ম্যাসিডন** শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

এথেন্স : মধ্যগ্রীসের এটিকা অঞ্চলে এথেন্স ছিল সর্ব প্রধান। প্রাচীনকালে এথেন্সের নেতৃত্বে এটিকার সবগুলি রাষ্ট্র মিলিত হয়ে গঠিত হয় এথেন্স রাষ্ট্র।

রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা : গ্রীসের অধিকাংশ নগরীর মত এথেন্সেও রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। কালক্রমে এথেন্সে অভিজাততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে **সোলন** নামে একজন সংস্কারক সেখানে গণতন্ত্রের ভিত্তি রচনা করেন। শাসনতন্ত্রের সংস্কারে সোলন জন্মগত অধিকার বলকে নাকচ করে আর্থিক ক্ষমতার ভিত্তিতে শাসনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে এথেন্স অভিজাত বংশীয়গণের স্বৈরাচারের অবসান ঘটে। সোলনের পর **ক্লাইসম্থিনিস** নামে আর একজন সংস্কারক ধনীদের প্রভাব প্রতিপত্তি খর্ব করে সাধারণ মানুষের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর এথেন্সে গণতন্ত্রের চরম বিকাশ ঘটে রাষ্ট্রনায়ক **পেরিক্লিসের** আমলে। সোলন এবং

ক্লাইস্থিনিসের সংস্কারের পরও অভিজাত ও ধনীকশ্রেণীর যেটুকু ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অবশিষ্ট ছিল পেরিক্লিসের সংস্কার সেটুকুও বিনষ্ট করে দেয়। ফলে ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই রাষ্ট্রের সেবা করার সুযোগ লাভ করে।

সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থা: এথেন্সের সমাজ প্রধানত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। স্বাধীন নাগরিক আর ক্রীতদাস ও বিদেশী। স্বাধীন নাগরিকদের মধ্যে আবার তিনটি শ্রেণী ছিল—সম্ভ্রান্তশ্রেণী, কৃষকশ্রেণী এবং নানা প্রকার শ্রম শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকশ্রেণী। এই স্বাধীন নাগরিকরাই কেবল রাষ্ট্রীয় সভার সভ্য হতে পারত, বিদেশী আর ক্রীতদাসদের এ অধিকার ছিল না। মেয়েরা সব রকম রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। এথেন্সের নাগরিকদের শিক্ষার জন্য সোলন কতকগুলি উল্লেখযোগ্য সংস্কার প্রবর্তন করেন। তাঁর সংস্কারের ফলে নাগরিকদের ছোটবেলা থেকে উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে হত। শিক্ষা গ্রহণের সাথে সাথে শিক্ষার্থীকে দৈহিক ব্যায়াম ও সঙ্গীত চর্চা করা অবশ্য কর্তব্য ছিল। দেহের এবং মনের উপযুক্ত বিকাশ সাধনই ছিল সোলনের সংস্কারের উদ্দেশ্য। ফলে, কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে প্রাচীন জগতের মধ্যে এথেন্স সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিরূপে পরিগণিত হয়েছিল। রাষ্ট্রনায়ক পেরিক্লিসের আমলেই এথেন্স জ্ঞানে গরিমায় পরিপূর্ণতা অর্জন করেছিল। সেকালের এথেন্সের গৌরবময় ঐতিহ্যকে আজও সকল জাতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

স্পার্টা: দক্ষিণ গ্রীসের **ল্যাকোনিয়া** অঞ্চলের নগর-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে **স্পার্টা** ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই স্পার্টাকে কেন্দ্র করেই গ্রীসের রাজনৈতিক ইতিহাস বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়।

রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা: স্পার্টার রাষ্ট্র প্রধান ছিলেন রাজা। কিন্তু রাজার ক্ষমতা **সিনেট** এবং **এফোর** নামে জনসাধারণের দুটি সংস্থা দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। সংস্থা দুটির প্রতিনিধি নির্বাচন করত **গণপরিষদ**। ত্রিশ বছর বয়স্ক সকল নাগরিকই গণপরিষদের সদস্য

হতে পারত। নীতির দিক দিয়ে স্পার্টার শাসন ব্যবস্থা ছিল গণতন্ত্র সম্মত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যেত ধনী অভিজাতরাই সিনেট এবং এফোরের সদস্য নির্বাচিত হতেন। কাজেই স্পার্টার এই গণতন্ত্র বিশেষ সাফল্য লাভ করেনি। স্পার্টার এই শাসনতন্ত্রকে প্রকৃত-পক্ষে ধনতান্ত্রিক শাসন বলা যেতে পারে।

সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থা: স্পার্টার সমাজ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। সর্বোচ্চ শ্রেণী হিসাবে স্পার্টানরা ছিল প্রথম শ্রেণীর নাগরিক। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে ছিল **পেরিওসি** সম্প্রদায়। এরা প্রাদেশিক শহরে বাস করত আর কিছু কিছু ব্যক্তি স্বাধীনতা ও স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার ভোগ করত। তবে গণ-পরিষদে এদের স্থান ছিল না এরপর সমাজের সকলের নীচে ছিল **হেল্‌ট** নামে ক্রীতদাস সম্প্রদায়। স্পার্টান আর পেরিওসিদের হাতে হেল্‌টদের নানারকম অত্যাচার ও নির্যাতন ভোগ করতে হত। অথচ এই হেল্‌টরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুযোগ পেলেই হেল্‌টরা স্পার্টানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত। কাজেই স্পার্টানরা হেল্‌টদের বিরুদ্ধে সর্বদাই সতর্ক থাকত।

কথিত আছে **লাইকারগাস** নামে একজন রাজপুরুষ কতকগুলি সংস্কার প্রর্বতন করে স্পার্টানদের এক বলিষ্ঠ সামরিক জাতিতে পরিণত করেছিলেন। তাঁর সংস্কারের ফলে স্পার্টানদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পূর্ণ রূপে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসে। সাত বছর বয়স থেকে শিশুর সামরিক শিক্ষা শুরু হত। সামরিক শিবিরেই তাকে জীবনের অধিকাংশ কাল কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে কাটাতে হত। ত্রিশ বছর বয়সে একজন স্পার্টান পূর্ণ নাগরিক অধিকার পেত কিন্তু তার ষাট বছর বয়স পূর্ণ হলে সে স্বাধীন ভাবে গৃহীর জীবন যাপন করার অধিকার পেত। মেয়েরা যাতে বীর সন্তানের জননী হতে পারে সেজন্য মেয়েদেরও ব্যায়াম চর্চা করতে হত। কোন বিকলাঙ্গ বা স্বাস্থ্যহীন শিশু ভূমিষ্ঠ হলে তাকে পাহাড়ের উপর থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করা হত। স্পার্টানদের কোন প্রকার উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার রীতি

ছিল না। সামান্য লেখা পড়া জানলেই যথেষ্ট মনে করা হত। কেবলমাত্র সামরিক বৃত্তি ছাড়া স্পার্টানরা অন্য কোন বৃত্তি গ্রহণ করতে পারত না।

লাইকারগাসের সংস্কারের ফলে স্পার্টানরা রাষ্ট্রের একান্ত অনুগত এক দুর্ধর্ষ সামরিক জাতিতে পরিণত হয়েছিল বটে, কিন্তু সংস্কৃতি জগতে তারা কোন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেনি। এথেন্সের সাথে স্পার্টার এই ছিল সবচেয়ে বড় তফাৎ।

এথেন্স বনাম স্পার্টা ঃ প্রাচীনকাল থেকেই স্পার্টা গ্রীসে নেতৃস্থানীয় হিসাবে সম্মানিত ছিল। কিন্তু পারসিকরা গ্রীস আক্রমণ করলে স্পার্টার সে সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়। কারণ, পারসিকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে স্পার্টার কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি। গ্রীসবাসীর সম্মান ও গৌরব রক্ষার দায়িত্ব পালন করেছিল এথেন্স। ফলে পারসিক আক্রমণের ঢেউ কেটে গেলে দেখা গেল এথেন্সকে সকলে গ্রীসের নেতৃত্ব পদে বসিয়েছে। বিভিন্ন রাষ্ট্র মিলে একটি রাষ্ট্রসংঘ স্থাপন করল। ডেলোস-দ্বীপে এই রাষ্ট্রসংঘের কার্যালয় স্থাপিত হল বলে এর নাম হল **কন্‌ফেডারিসি অব্ ডেলোস** বা **ডেলোসের রাষ্ট্রসংঘ**। সব রাষ্ট্র মিলে এথেন্সকে এই রাষ্ট্র সংঘের নেতা করল। কালক্রমে রাষ্ট্র-সংঘ ভেঙে গেলেও গ্রীকজাতির উপর এথেন্সের নেতৃত্ব অটুট থেকে যায়। পেরিক্লিসের আমলে এথেন্স বিরাট এক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে পরিণত হয়। কিন্তু এথেন্সের এই নেতৃত্ব অনেকে আর পছন্দ করল না। বিশেষ করে স্পার্টা এথেন্সের সাফল্যে ভয়ানক ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছিল। এথেন্সের নেতৃত্ব যারা পছন্দ করত না তাদের নিয়ে স্পার্টা এথেন্স বিরোধী একটা জোট গঠন করল। সামান্য কারণকে উপলক্ষ্য করে খ্রীঃ পূঃ ৪৩১ অব্দে স্পার্টা এথেন্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। স্পার্টা ও পেলোপনেসাস বা দক্ষিণ গ্রীসের সাথে এথেন্সের যে যুদ্ধ হয় তা ইতিহাসে **পেলোপনেসিয়ান** যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধ চলেছিল ২৭ বছর ধরে। এই যুদ্ধে

এথেন্স শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। স্পার্টা আবার গ্রীসে তার অতীত প্রাধান্য ফিরে পায়। স্পার্টার এই প্রাধান্যের ফলে গ্রীসে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা লুপ্ত হয় এবং অভিজাতদের দ্বারা পরিচালিত ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা গ্রীকদের উপর চেপে বসে।

সভ্যতার ক্ষেত্রে এথেন্সের অবদানঃ সু-প্রাচীনকাল থেকেই এথেন্সের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য ছিল দেহ ও মনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন। তাই এথেন্স সাংস্কৃতিক জগতে মহিয়ান হয়ে উঠেছিল। পেরিক্লিসের আমলে এথেন্স কেবল অর্থনৈতিক দিক দিয়েই নয় জ্ঞানে, গরিমায়, শিল্পে, সাহিত্যে সারা গ্রীসে শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী হয়েছিল। তাই গ্রীসের ইতিহাসে পেরিক্লিসের যুগকে 'স্বর্ণ যুগ' বলা হয়। তিনি কেবল স্থপতি বা ভাস্করই আনেননি, তিনি এনেছিলেন কবি, দার্শনিক ও শিক্ষক।


পেরিক্লিস

সাহিত্যঃ নাট্য সাহিত্যে এথেন্স অনবদ্য উৎকর্ষতার পরিচয় দিয়েছিল। এথেন্সের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের মধ্যে এস্কাইলাস, সোফোক্লিস ও ইউরিপিডিসের নাম জগৎ বিখ্যাত হয়ে আছে। সৌন্দর্য ও মহত্বে তাদের নাটকগুলি আজও সকলকে মোহিত করে। বিয়োগান্ত নাটক রচনায় **সোফোক্লিস** ছিলেন সিদ্ধ পুরুষ। তাঁর নাটকগুলির মধ্যে **এন্টিগোন** এথেন্সে সব চেয়ে জনপ্রিয় ছিল। গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ কমেডিয়ান **এরিষ্টোফেনেস** এই যুগেই এথেন্সে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

দর্শনঃ সক্রেটিস নামে একজন মহাপণ্ডিত দার্শনিক এথেন্সে জন্মগ্রহণ করেছিলেন (খ্রীঃ পূঃ ৪৬৯ অব্দে)। দিনের মধ্য

অধিকাংশ সময়ই তিনি পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন আর লোককে ধরে ধরে নতুন জ্ঞানের কথা শোনাতেন। প্রচলিত ধ্যান ধারণার অসারতার কথা তিনি সকলকে বোঝাতেন। তাঁর কথায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁর অনেক শিষ্য জুটে যায়। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়, তিনি দেশের যুবকদের মাথা নষ্ট করছেন। শেষ পর্যন্ত বিচারে সক্রেটিসের প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। নিজ হাতে তীব্র হেমলক বিষ পান করে তিনি প্রাণ বিসর্জন করেন। সক্রেটিসের সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন **প্লেটো** আর প্লেটোর শিষ্য ছিলেন **এরিস্টটল**। এই এরিস্টটল মহাবীর আলেকজান্দারের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন।



সক্রেটিস

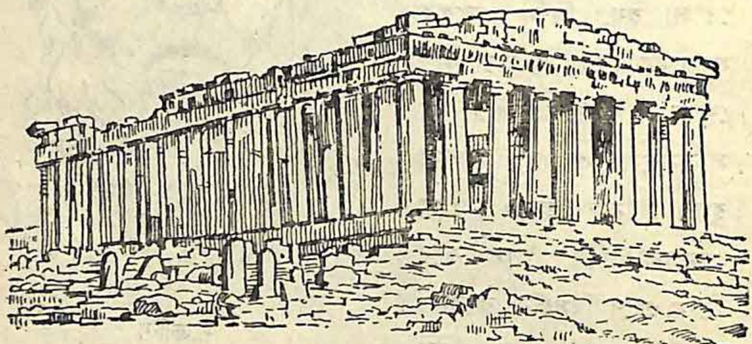
ইতিহাস ঃ গ্রীক ঐতিহাসিক **হেরোডোটাসকে** বলা হয় ইতিহাসের জনক। তিনি খ্রীঃ পূঃ ৪৪৬ অব্দে এথেন্সে এসেছিলেন তাঁর ইতিহাস শোনাতে। ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি ব্যাবিলন ও মিশরে গিয়েছিলেন। তিনি গ্রীক ও পারসিকদের যুদ্ধের ইতিহাস রচনা করেছিলেন। তাঁর রচনা থেকে মিশরের পিরামিড নির্মাণের অনেক তথ্য আমরা জেনেছি। এই যুগেরই আর একজন ঐতিহাসিক



হেরোডোটাস

থুকিদীদিস **পেলোপনেসিয়ান যুদ্ধের ইতিহাস** রচনা করে অমর হয়ে আছেন।

শিল্প ঃ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে এথেন্স সে যুগে অভাবনীয় উন্নতি করেছিল। এথেন্সে **পার্থেনন, প্রপাইলি, ইরেকথিয়ান** প্রভৃতি সুদৃশ্য অট্টালিকা ও হর্মরাজি নির্মিত হয়েছিল। শ্রেষ্ঠ ভাস্কর **ফিডিয়াস** দেবী এথেনার ও ভগবান জিউসের মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন। এথেন্সের **এগোরা** ছিল নাগরিকদের মিলন ক্ষেত্র। এই এগোরাকে



পার্থেননের মন্দির

ঘিরে সুদৃশ্য মন্দির ও ইমারৎ নির্মিত হয়েছিল এবং তাতে শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের হাতে শ্বেতপাথরে খোদাই করা অপূর্ব সব মূর্তি ও কারু-কার্য মণ্ডিত খোদাই শিল্প শোভা পেত। এছাড়া নানা রকম মৃৎ-পাত্র, প্রস্তর নির্মিত পাত্র ও ধাতু পাত্রের গায়ে অনবদ্য চিত্রশিল্পের পরিচয়ও পাওয়া যায়।

ধর্ম ঃ প্রাচীন অপরাপর সভ্যতার মত এথেন্সের লোকেরাও প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে দেব-দেবী রূপে কল্পনা করত। এথেন্স তথা গ্রীসের দেবদেবীরা মানুষের রূপ ধরতেন, মানুষের সুখদুঃখের ভাগীদার হতেন। তাদের প্রধান দেবতা ছিলেন সর্ব শক্তিমান **জিউস**। তাঁর আবাসস্থল ছিল অলিম্পিয়া পাহাড়ের চূড়ায়। ভগবান **এ্যাপোলো** ছিলেন সৌন্দর্য ও সুকুমার শিল্পের দেবতা। **পসিডন** ছিলেন সমুদ্রের দেবতা আর এথেন্সের দেবী ছিলেন **এথেনা**।

গ্রীসের এই দেব-দেবীকে নিয়ে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। মন্দিরের পুরোহিতরা ছিলেন অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তাঁদের



জিউস



এপোলো

মাধ্যমেই দেব-দেবীর সাথে সাধারণ মানুষের কথোপথন হত। পুরোহিতরা দৈববাণী হিসাবে সাধারণ মানুষকে দেব-দেবীর নির্দেশ শোনাতেন। এই দৈববাণীকে বলা হত **ওরাক্‌ল**।

ম্যাসিডন

গ্রীসের উত্তর অঞ্চলে ছিল ম্যাসিডন রাজ্য। অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতার মধ্য দিয়ে উন্নত গ্রীকজাতিগুলির সাথে ম্যাসিডন রাজ্যবাসীদের পরিচয় ছিল। খ্রীষ্ট পূর্ব চতুর্থ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ম্যাসিডনের রাজা হন **ফিলিপ**। ফিলিপ গ্রীসের ছোট ছোট রাজ্য-গুলিকে একত্রিত করে গ্রীসকে একটি বড় রাজ্যে পরিণত করেন।

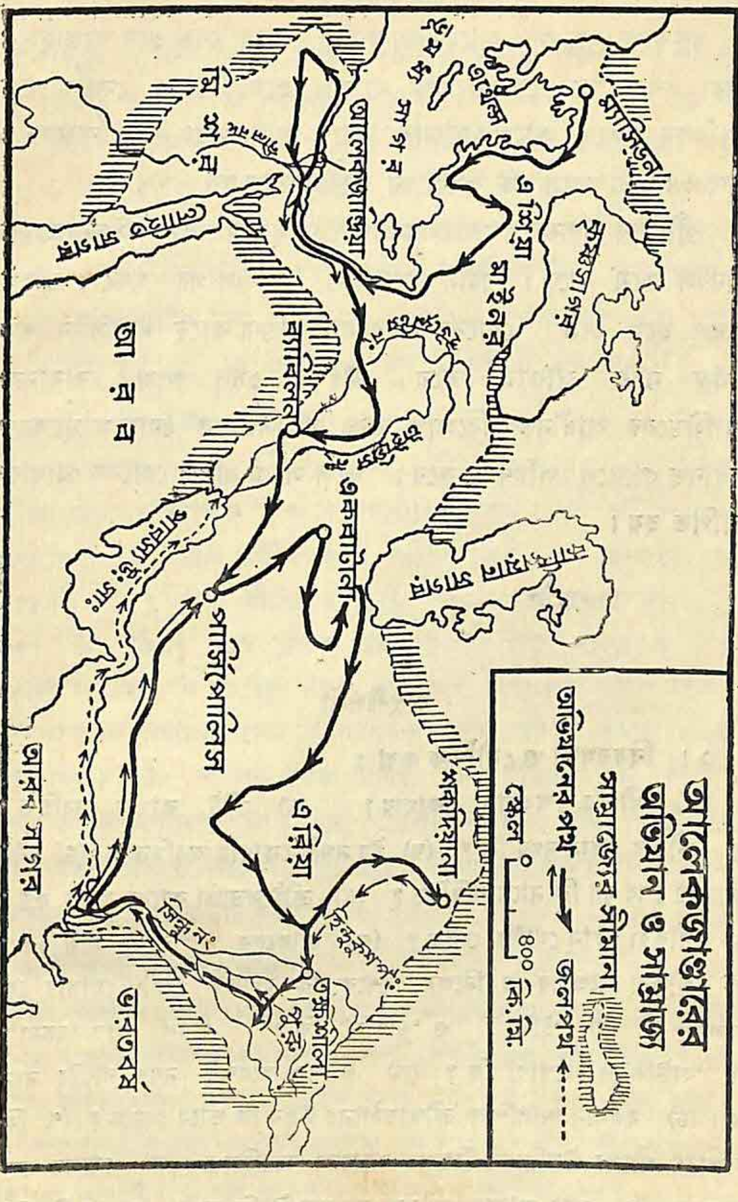
আলেকজান্দার ঃ ফিলিপের মৃত্যুর পর খ্রীষ্ট পূর্ব ৩২৬ অব্দে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে তার পুত্র আলেকজান্দার ম্যাসিডনের রাজা হন। ছোট বেলা থেকেই তিনি যুদ্ধ বিদ্যায় খুব পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। আলেকজান্দারের একান্ত ইচ্ছা ছিল সমগ্র পৃথিবী জয়

করে উন্নত গ্রীক সভ্যতাকে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দেবেন। তাঁরই চেষ্টায় সেকালে এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে মিলন সেতু রচিত হয়েছিল।

পারস্য সম্রাটরা এক সময় গ্রীসের অনেক ক্ষতি করেছিল। আলেকজান্দার প্রথমে পারস্য অভিযান করেন। টায়ার, জেরুজালেম প্রভৃতি শহর পদানত করে তিনি মিশর অভিযান করেন। মিশর জয়ের চিহ্ন স্বরূপ তিনি **আলেকজান্দ্রিয়া** নগর স্থাপন করেন। মিশর থেকে প্রত্যাবর্তন করে তিনি **ব্যাবিলন, সুসা, পারসি-পোলিস, একবেটেনা** প্রভৃতি জয় করে ও পারস্য সম্রাজ্য পদানত করে ভারতবর্ষে অভিযান করেন।


আলেকজান্দার

ভারত অভিযান: পারস্য জয় সম্পন্ন করে আলেকজান্দার হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে ভারতবর্ষে এসে পৌঁছান। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে তখন অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য ছিল। এই রাজ্যগুলির মধ্যে কোন সদ্ভাব ছিল না। অনেক রাজ্যই বিনা যুদ্ধে আলেকজান্দারের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। কিন্তু পুরু রাজ আলেকজান্দারকে বাধা দিলেন। মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য পুরু বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে পরাজিত ও বন্দী হলেন। বন্দী পুরুকে আলেকজান্দারের কাছে আনা হলে আলেকজান্দার পুরুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বন্দী, তুমি আমার কাছে কিরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর? নির্ভীক পুরু উত্তর দিলেন, 'রাজার প্রতি রাজার যেরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত আমি সেইরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করি।' এই উত্তরে আলেকজান্দার খুব খুশী হলেন। তিনি বীর পুরুকে মুক্তি দিয়ে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন।


আলেকজাণ্ডারের অভিযান ও সাম্রাজ্য
সাম্রাজ্যের সীমানা
অভিযানের পথ
জলপথ
স্কেল ০ ৪০০ কি.মি.
ম্যাসিডন
কৃষ্ণসাগর
এশিয়া মাইনর
ভূমধ্য সাগর
আলেকজান্দ্রিয়া
লোহিত সাগর
আরব
ব্যাবিলন
একবাটানা
কাস্পিয়ান সাগর
পার্সেপোলিস
পারস্য উপসাগর
আরব সাগর
ভারতবর্ষ

বহুকাল যুদ্ধ করে আলেকজান্দারের সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তারা এবার ঘরে ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। ফেরার পথে ব্যাবিলন নগরে আলেকজান্দার অসুস্থ হয়ে মৃত্যু বরণ করলেন। মাত্র ৩৪ বছর বয়সে এই কর্মবীরের জীবনাবসান হয়।

গ্রীসের পতন ঃ আলেকজান্দারের মৃত্যুর পর ম্যাসিডন ক্রমশ হীনবল হয়ে পড়ে। রোম সাম্রাজ্য ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে ক্রমশ প্রবল হয়ে ওঠে। রোমের ক্রমবর্ধমান শক্তির কাছে ম্যাসিডন শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করে। খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৭ অব্দে রোমানরা ম্যাসিডনের স্বাধীনতা বিলোপ করে ম্যাসিডনকে রোম সাম্রাজ্যের অধীনস্থ প্রদেশে পরিণত করে। ফলে সমগ্র গ্রীসে রোমের প্রাধান্য স্থাপিত হয়।

অনুশীলনী

১। বিষয়মুখী ও মৌখিক প্রশ্ন ঃ

(ক) গ্রীসের অবস্থান কোথায়? (খ) ক্রীট কোথায় অবস্থিত? (গ) ক্রীটের প্রধান নগর কি? (ঘ) ট্রয় নগরী কোথায় অবস্থিত? (ঙ) ক্রীট সভ্যতার শেষ যুগ কি নামে পরিচিত? (চ) ক্রীট সভ্যতা কাদের কাছে ঋণী? (ছ) গ্রীকরা কোন্ গোষ্ঠীর লোক? (জ) গ্রীকদের পূর্বপুরুষের নাম কি? (ঝ) গ্রীকরা নিজেদের ও নিজের দেশকে কি বলত? (ঞ) হোমার কে ছিলেন? (ট) 'ইলিয়ট' ও 'ওডিসি' কি? এগুলি কার রচনা? (ঠ) 'বাউলি' ও 'এগোরা' কি? (ড) গ্রীসের কয়েকটি নগর রাষ্ট্রের নাম কর। (ঢ) বর্তমান অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের উদ্ভব কি ভাবে হয়েছে? (ণ) কি কি কারণ গ্রীসের উপনিবেশ বিস্তারে সহায়তা করেছিল? (ত) সোলন কে ছিলেন? (থ) কার আমলে এথেন্সের সবচেয়ে উন্নতি হয়? (দ) 'পেরিওসি' কাদের বলা হত? (ধ) 'হেলট্' কাদের বলা হত? (ন) স্পার্টার উল্লেখযোগ্য সমাজ সংস্কারক কে ছিলেন? (প) 'সেনেট' ও 'এফোর' কি? (ফ) কোন্ জাতি প্রথম গ্রীস আক্রমণ করেছিল? (ব) কন্‌ফেডারেসি অব

ডেলোস কি ? (ভ) পেলোপনেসিয়ান যুদ্ধ প্রধানত কার কার সাথে হয়েছিল ? এই যুদ্ধ কত সালে হয়েছিল এবং কত বছর ধরে চলেছিল ? (ম) এথেন্সের স্বর্ণ যুগ কোন্ কালকে বলা হয় ? (য) ইতিহাসের জনক কাকে বলা হয় ? (র) পেলোপনেসিয়ান যুদ্ধের ইতিহাস কে রচনা করেন ? (ল) এথেন্সের কয়েকজন নাট্যকারের নাম কর। (ব) এথেন্সের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের নাম কর। (শ) এথেন্সের উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন কি কি ? (ষ) এথেন্সের একজন শ্রেষ্ঠ ভাস্করের নাম কর। (স) এথেন্সের দেব-দেবীর নাম কর। (হ) 'ওরাকল্' কি ? (ড়) গ্রীসের অন্যতম দিগ্বিজয়ী বীর কে ছিলেন ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) গ্রীসের অবস্থান ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য কি ? (খ) ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য গ্রীসের ইতিহাসকে কি ভাবে প্রভাবান্বিত করেছে ? (গ) ক্রীট সভ্যতার গুরুত্ব কি ? (ঘ) গ্রীক জাতির আদি পরিচয় কি ? (ঙ) হোমারের যুগ বলতে কি বোঝ ? (চ) গ্রীসের নগররাষ্ট্রগুলির মধ্যে অনৈক্যের কারণ কি ছিল ? (ছ) কি কি বিষয় গ্রীসের নগররাষ্ট্রগুলির মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্য এনেছিল ? (জ) কি কি বিষয় গ্রীসের উপনিবেশ বিস্তারের সহায়ক ছিল ? (ঝ) এথেন্সের সামাজিক জীবন কিরূপ ছিল ? (ঞ) স্পার্টার সমাজ ব্যবস্থা কিরূপ ছিল ? (ট) স্পার্টার শিক্ষা ব্যবস্থা কিরূপ ছিল ? (ঠ) স্পার্টার রাজনৈতিক জীবন কিরূপ ছিল ? (ড) পেলোপনেসিয়ান যুদ্ধের কারণ কি ছিল ? (ঢ) স্পার্টা ও এথেন্সের শিক্ষা ব্যবস্থায় কি পার্থক্য ছিল ? (ণ) এথেন্সের কয়েকজন কৃতি পুরুষের নাম কর।

৩। রচনা ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) ক্রীট সভ্যতার বিবরণ দাও। (খ) এথেন্সের রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষা ব্যবস্থার বিবরণ দাও। (গ) স্পার্টার রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষা ব্যবস্থার বিবরণ দাও। (ঘ) সক্রেটিস কে ছিলেন ? তাঁর সম্বন্ধে কি জান ? (ঙ) সভ্যতার ইতিহাসে এথেন্সের অবদান কি ? (চ) গ্রীক বীর আলেকজান্দারের দিগ্বিজয় বর্ণনা করে তাঁর ভারত অভিযানের কাহিনী লেখ।

৩। রোম

অবস্থান ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ঃ ইউরোপে বলকান উপদ্বীপের দক্ষিণে ভূমধ্যসারের বুকে যে দেশটা অনেকটা বুটজুতার মত দেখতে সেটাই **ইটালি**। গ্রীসের মত ইটালি পাহাড় পর্বত সঙ্কুল হলেও তা গ্রীসের মত অত দুর্গম নয়। ইটালির উত্তরে রয়েছে দুর্গম আলপস্ পর্বতশ্রেণী। এই পর্বতশ্রেণী উত্তরের শীতল বায়ুকে প্রতিরোধ করার ফলে ইটালীর আবহাওয়া অনেকটা উষ্ণ। দেশের মধ্যভাগে রয়েছে টাইবার নদী। পশ্চিমের সমুদ্র মোহনা থেকে পঁচিশ কিলোমিটার দূরে টাইবারের তীরে গড়ে উঠেছিল ইটালির সব থেকে উল্লেখযোগ্য শহর **রোম**। ইটালির ইতিহাস বলতে এই রোমের ইতিহাসকে বুঝায়।

রোম নগরীর উত্থান ঃ রোমের উৎপত্তি সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ইতিহাস নেই। একটা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে **রোমুলাস** এবং **রেমাস** নামে দুই যমজ শিশুকে রাজার আদেশে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল। এক নেকড়ে বাঘ বুকের স্তন দিয়ে শিশু দুইটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। পরে এক মেষপালক তাদের লালন পালন করে বড় করে তোলে। এদের মধ্যে রোমুলাসই বড় হয়ে রোম নগরীর পত্তন করেন। রোমুলাসের নামানুসারে নগরীর নাম হয় **রোম**। কিংবদন্তীর কথা হয়ত কাল্পনিক। তবে রোমানদের বিশ্বাস রোমুলাস রোম নগরীর পত্তন করেছিলেন খ্রীষ্টপূর্ব ৭৫৩ অব্দে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগেই ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির বিভিন্ন শাখা ইটালির বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। এদের মধ্যে **ল্যাটিন** ভাষা গোষ্ঠীর লোকেরাই ছিল সব থেকে উল্লেখযোগ্য। রোমকে বিকশিত করে তোলার ব্যাপারে এই ল্যাটিন ভাষা গোষ্ঠীর লোকদের ভূমিকাই ছিল প্রধান। গ্রীসের যখন পড়ন্ত অবস্থা, বিপুল শক্তি নিয়ে রোমের তখন উত্থান ঘটছে।

রোম ও কার্থেজ ঃ ইটালিতে রোম যখন ক্রমশ বড় হচ্ছে, তখন আফ্রিকার উত্তর উপকূলে প্রসিদ্ধ **কার্থেজ** নগরী ভূমধ্য-সাগর ও স্পেনের উপকূলে প্রভুত্ব করেছে। এশিয়ার **ফিনিশায়** বণিকদের শ্রেষ্ঠ উপনিবেশ ছিল এই কার্থেজ। নৌ-শক্তি ও বাণিজ্য-বলে কার্থেজ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। ইটালির দক্ষিণে **সিসিলি** দ্বীপের পশ্চিম অংশটাও ছিল কার্থেজের অধীনে। কাজেই রোম যখন ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে তখন কার্থেজর সাথে রোমের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল।

রোমের সাথে কার্থেজের যুদ্ধগুলি ইতিহাসে **পিউনিক** যুদ্ধ নামে খ্যাত। প্রথম পিউনিক যুদ্ধ হয়েছিল (খ্রীঃ পূঃ ২৭০ অব্দে) সিসিলির উপর অধিকার বিস্তার নিয়ে। এই যুদ্ধে কার্থেজ পরাজিত হলেও তাদের বিশেষ ক্ষতি হয়নি। এর পর (খ্রীঃ পূঃ ২১৮ অব্দে) দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে কার্থেজের সময় নায়ক ছিলেন হামিলকার বার্কার সুযোগ্য পুত্র **হানিবল**। হানিবলের মত এমন প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে রোমানদের আর কখনও যুদ্ধ করতে হয়নি। হানিবল বিপুল বাহিনী নিয়ে স্পেন থেকে রওনা হয়ে দুর্গম আলপস্ পর্বত পার হয়ে হঠাৎ উত্তর ইটালি আক্রমণ করে বসেন। তারপর অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে ইটালির একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত মথিত করে রোমানদের নিদারুণ সঙ্কটের মধ্যে ফেলে দেন। রোমানরা একে একে **টিসিনাস, ট্রিবিয়া, ট্রাসিমেন হ্রদ** ও **ক্যানির** যুদ্ধে ভীষণ ভাবে পরাজিত হন। অবশেষে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। রোমান সেনাপতি **সিপিও** স্পেনে কার্থেজের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন আর ইটালিতে **বেনেভেন্টামের** যুদ্ধে হানিবল রোমানদের হাতে পরাজিত হন। সিপিও সিসিলি জয় করে আফ্রিকাতে অভিযান করলেন। হানিবল ইতালি থেকে ছুটে এলেন স্বদেশ রক্ষায়। কিন্তু (খ্রীঃ পূঃ ২০২ অব্দে) হানিবল **জামার** যুদ্ধে সিপিওর হাতে পরাজিত হলেন। কার্থেজ রোমের

করদ রাষ্ট্রে পরিণত হল। শেষ পর্যন্ত হানিবল ব্যর্থ মনোরথ হয়ে বিষ পান করে আত্মহত্যা করেন।

এর পর রোম ক্রমশঃ **গ্রীস, সিরিয়া, মিশর, স্পেন** প্রভৃতি অঞ্চলে সাম্রাজ্য বিস্তার করে। তারপর শুরু হয় রোমের সাথে কার্থেজের **তৃতীয় পিউনিক** যুদ্ধ। এই যুদ্ধ ছিল কার্থেজের আত্মরক্ষার যুদ্ধ। কিন্তু সাম্রাজ্য মদমত্ত রোম অন্যায় ভাবে কার্থেজ নগরীকে ধ্বংস করে প্রায় সত্তর হাজার কার্থেজবাসীকে ক্রীতদাসে পরিণত করে।

আদি রোমান সমাজ ঃ রোমের আদিম সমাজ কতগুলি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। গোষ্ঠীগুলি ক্রমশঃ পরিবারে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক পরিবারের নিজস্ব ভূসম্পত্তি নির্দিষ্ট থাকত এবং সকল পরিবারের জন্য একটি সাধারণ গো-চারণ ভূমি নির্দিষ্ট থাকত। সমাজে ক্রীতদাস ছিল। কেউ ঋণ শোধ করতে না পারলে তাকে ঋণদাতার কাছে ক্রীতদাস হিসাবে কাজ করতে হত। তবে রোমের আদিম সমাজ ব্যবস্থায় ক্রীতদাসদের পরিবারের আপনজন বলে মনে করা হত।

প্রাচীনকালে রোম রাজতন্ত্র প্রচলিত থাকলেও রাজার ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ। প্রতি বছর দুইজন করে **কন্‌সাল** বা অভিভাবক নির্বাচিত করা হত। এই কন্‌সালরাই বিচার করতেন, যুদ্ধ পরিচালনা করতেন। শান্তির সময় বয়স্ক ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সভা আহ্বান করে তাঁদের মতামত গ্রহণ করা হত। বয়স্ক ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের এই সভাকে **সিনেট** বলা হত। কাজেই দেখা যায় রোমে খুব প্রাচীনকাল থেকেই সাধারণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু ছিল।

সমাজের অধিকাংশ লোকই কৃষিকাজ করত। কৃষিকাজ ছাড়া অনেকে নানা রকম কারিগরি কাজ নিয়েও ব্যস্ত থাকত।

প্যাট্রিসিয়ান-প্লেবিয়ান বিরোধ ও রোমের নাগরিকত্ব ঃ রোমের প্রাচীনতম যে সব নাগরিক রোম নগরী প্রতিষ্ঠা করেছিল তাদের বংশধররা নিজেদের **প্যাট্রিসিয়ান** বলত। ল্যাটিন ভাষায়

প্যাট্রিসিয়ান কথার অর্থ পিতা। প্যাট্রিসিয়ানদের পিতৃকুল অর্থাৎ পূর্বপুরুষ রোম নগরী প্রতিষ্ঠা করেছিল বলে তারা খুব গৌরব বোধ করত। রোম ক্রমশ পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিকে গ্রাস করে যখন বড় হয়ে উঠল, তখন পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে যারা বসবাস করত তাদের বলা হত **প্লেবিয়ান**। রাষ্ট্রের শাসন কার্যে অংশ গ্রহণ করার কোন অধিকার প্লেবিয়ানদের ছিল না। রাষ্ট্রের নাগরিক বলতে যা বোঝায় তা ছিল কেবল প্যাট্রিসিয়ানরা। অথচ প্লেবিয়ানরাও রোমকে নানা ভাবে সেবা করত। ফলে প্লেবিয়ানদের সাথে প্যাট্রিসিয়ানদের বিরোধ বেঁধে উঠল। প্রায় সুদীর্ঘ দুশ বছর ধরে চলছিল প্লেবিয়ানদের এই নাগরিক অধিকারের লড়াই। শেষ পর্যন্ত প্যাট্রিসিয়ানরা প্লেবিয়ানদের নাগরিক অধিকার ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। এরপর প্লেবিয়ানদেরও সিনেটের সভ্য ও কনসাল নিযুক্ত হতে কোন বাধা রইল না।

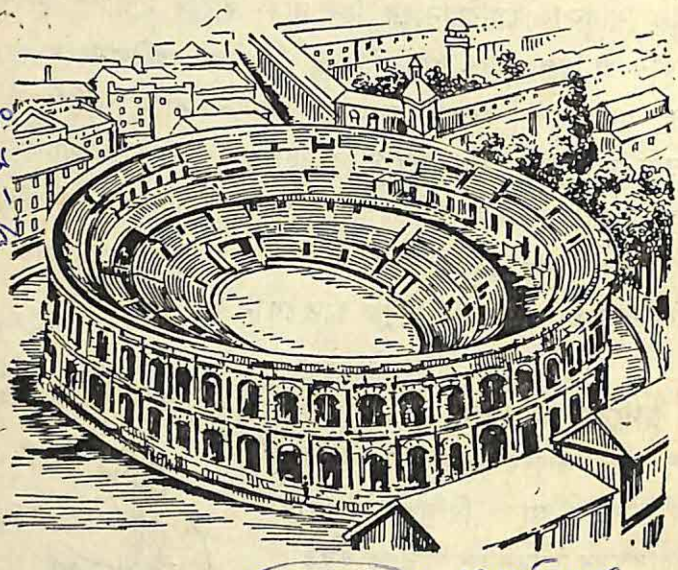
রোমের ক্রীতদাস ঃ সেকালে রোমানরা প্রতিবেশী রাজ্যগুলি দখল করে তাদের ভূ-সম্পত্তি হস্তগত করে নিত, আর বিজিত রাজ্যের অধিবাসীদের ক্রীতদাসে পরিণত করত। রোমের ধনী ব্যক্তিরা এই সব হতভাগ্য ক্রীতদাসদের কিনে নিত।



ক্রীতদাস

রোমের এই ক্রীতদাসদের জীবন ছিল দুর্বিসহ। অভিজাতরা তাদের দিয়ে ক্ষেতে, খামারে, খনিতে ও পাথর-খাদে কাজ করাত। নৌকার দাড়টানার কাজেও তাদের ব্যবহার করা হত। অবাধ্য ক্রীতদাসদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হত। এমন কি ক্রুশে বিদ্ধ করে তাদের হত্যা করা হত। যে সব ক্রীতদাস বৃদ্ধ হয়ে কাজের অযোগ্য হয়ে পড়ত, তাদের কোন নির্জন দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হত। সেখানে তারা অনাহারে মারা যেত।

ধনী রোমানরা ক্রীতদাসদের হিংস্র জন্তু জানোয়ার বা অপর ক্রীতদাসদের সাথে লড়াই বাঁধিয়ে দিয়ে খুব আমোদ অনুভব করত। এই সব লড়াকু ক্রীতদাসদের বলা হত **গ্ল্যাডিয়েটর**। বহু গ্যালারী বিশিষ্ট মস্ত ঘেরা জায়গায় এই সব লড়াই হত। গ্যালারী বিশিষ্ট এই সব ঘেরা জায়গাগুলিকে বলা হত **এম ফি থিয়েটার**। আবার



এম ফি থিয়েটার

কলোসিয়ামও বলা হত। হাজার হাজার দর্শক এম ফি থিয়েটারে গ্ল্যাডিয়েটরদের নিষ্ঠুর লড়াই দেখতে আসত। ঢাল, তলোয়ার, বল্লম নিয়ে লড়তে লড়তে হতভাগ্য এক একজন গ্ল্যাডিয়েটর মারা পড়ত। তাই দেখে হৃদয়হীন রোমানরা উল্লাস ধ্বনিতে ফেটে পড়ত।

ক্রীতদাস বিদ্রোহ ও স্পার্টাকাস ঃ সুদীর্ঘকাল ধরে নির্যাতন ভোগ করে ক্রীতদাসদের মনে এক সময় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল। খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতকে ইটালির **ক্যাপুয়া** নগরীর কিছু সংখক ক্রীতদাস কারগার ভেঙে নিজেদের মুক্ত করল, তারপর তারা বিসুভিয়াস পর্বতের উপর আঙ্গুর ক্ষেতে গিয়ে আশ্রয় নিল। সেখানে তারা **স্পার্টাকাসকে** তাদের নেতা নির্বাচন করল। স্পার্টাকাস

যেমন ছিলেন বুদ্ধিমান তেমনি সাহসী ও বলবান। স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে তারা দাস-মালিক বা প্রভুদের নগরগুলিতে অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে তাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও রসদ কেড়ে নিল। ক্রমশ পাশের নগর-গুলি থেকেও ক্রীতদাসরা এসে বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দিল। রোমানরা বিদ্রোহীদের দমন করতে এসে ব্যর্থ হল। স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে বিদ্রোহী বাহিনী উত্তর ইতালির আলপস্ পর্বতের সানু-দেশে এসে উপস্থিত হল। আল্পস্ পর্বত পার হলেই তারা মুক্তি লাভ করতে পারত। কিন্তু বিদ্রোহীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেওয়ায় স্প্যার্টাকাস বিদ্রোহীদের নিয়ে ফিরে এলেন ইটালির একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে। সমুদ্র প্রণালী পার হয়ে সিসিলিতে যাওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু কয়েকজন জলদস্যুর বিশ্বাস-ঘাতকতায় তার সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল। ইতিমধ্যে রোমান বাহিনী শক্তি সঞ্চয় করে বিদ্রোহীদের দমন করতে ছুটে এল। বিদ্রোহীরা বীর বিক্রমে লড়াই করল রোমানদের সাথে। পিছন দিক থেকে অতর্কিতে একটা বর্শা এসে স্পার্টাকাসের উরুতে বিদ্ধ হল। আহত স্পার্টাকাসকে রোমানরা ঘিরে ফেলল এবং স্পার্টাকাসকে তারা নৃশংসভাবে হত্যা করল। শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহীরা পরাজিত হল।

নিজেদের মধ্যে মতভেদ ও অনৈক্যের ফলে বিদ্রোহীরা পরাজিত হল। ক্রীতদাসরা পরাজিত হলেও তাদের বিদ্রোহ একেবারে ব্যর্থ হয়নি। আজও পৃথিবীর সব দেশে শোষিত ও অত্যাচারিত মানুষের মনে এই ক্রীতদাস বিদ্রোহের কাহিনী প্রেরণা যোগায়। বিদ্রোহ দমন করার পর রোমানরাও ক্রীতদাসের প্রতি তাদের আচরণ পরিবর্তন করেছিল।

জুলিয়াস সীজার ও রোম সাধারণতন্ত্রের অবসান: ক্রীতদাস বিদ্রোহের পর থেকেই রোম সাধারণতন্ত্রের প্রতি অভিজাত রোমানদের আস্থা ক্রমশ কমতে থাকে। কারণ সাধারণতন্ত্রের নায়করা বিদ্রোহের হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে পারেনি, রক্ষা করেছিল রোমান সেনানায়করা। তা ছাড়া রোম নানা রকম

সংকটের মধ্যে পড়েছিল। দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ও চরম আকার ধারণ করেছিল। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে কয়েকজন সামরিক নেতার আর্বিভাব ঘটল। এদের মধ্যে **মেরিয়াস, সুল্লা, পম্পে** এবং **জুলিয়াস সীজারের** নাম উল্লেখযোগ্য। কালক্রমে জুলিয়াস সীজার-ই রোমে প্রধান্য স্থাপন করতে সক্ষম হলেন।


জুলিয়াস সীজার

সামরিক প্রতিভায় সেকালে সীজারের সমকক্ষ আর কেউ ছিল না। তিনি ফ্রান্স জয় করেন এবং জার্মানীর কিছু অংশ রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি দুবার ব্রিটেন অভিযান করে ব্রিটেন জয় করেন। এই সময় রোমে আর একজন শক্তিশালী সমর নায়ক ছিলেন **পম্পে**। দুজনেরই ইচ্ছা ছিল রোমের একচ্ছত্র অধীশ্বর হওয়া। কিন্তু সীজার পম্পেকে পরাজিত করে রোমের অধীশ্বর হয়ে বসলেন। সীজারের প্রধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথেই প্রকৃত পক্ষে রোম সাধারণতন্ত্রের অবসান ঘটল। রাজা উপাধি গ্রহণ না করলেও সীজার রাজার মতই ক্ষমতায় প্রয়োগ করতে লাগলেন।

সীজার কেবল সামরিক প্রতিভাধরই ছিলেন না, তিনি আরও নানা গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন শিক্ষিত ও উদার। তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার তিনি কখনও করেন নি। দরিদ্র প্রজাদের দুঃখ লাঘব করার চেষ্টা করে তিনি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন।

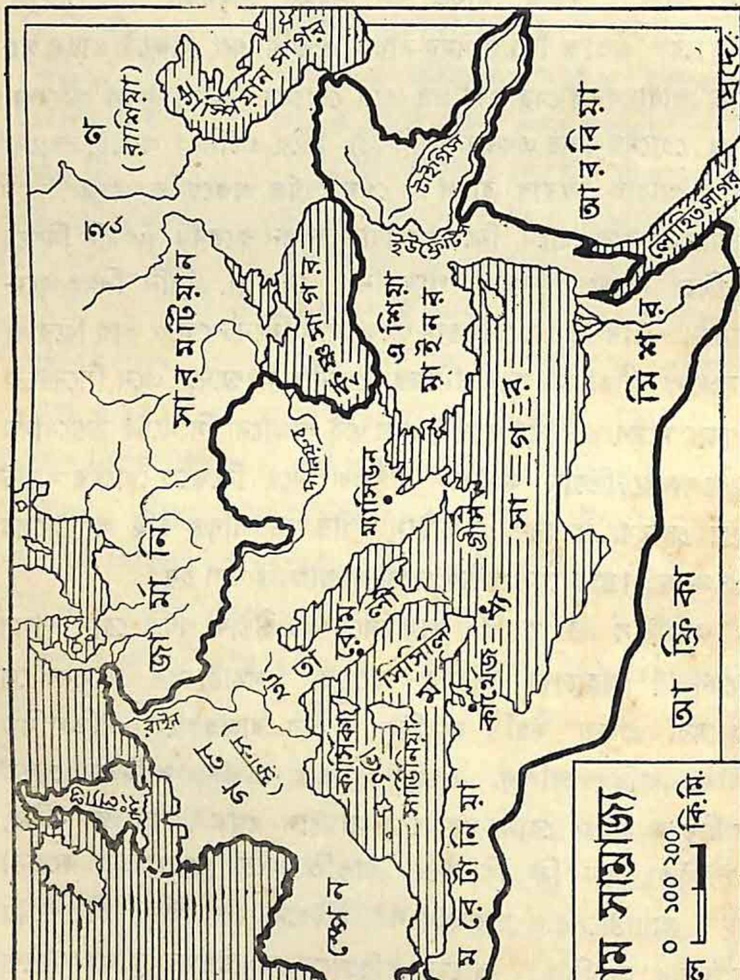
নতুন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাঃ সাধারণতন্ত্রীরা কিন্তু সীজারের এই প্রাধান্য মোটেই সহ্য করতে পারল না। তাই তারা সীজারকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য গোপনে ষড়যন্ত্র শুরু করল। তারা আবার সিনেটের ক্ষমতা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে চাইল। সীজার বিরোধী এই

সিনেট সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন **ব্রুটাস** এবং **কেসিয়াস** তাঁদের নেতৃত্বে একদিন সীজারকে হত্যা করা হল। কিন্তু সীজার যখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে তখন তাঁকে হত্যা করে সাধারণতন্ত্রীরা চরম ভুল করল। রোমে আরম্ভ হল ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলা আর গৃহযুদ্ধ। সীজারের একান্ত বিশ্বস্ত সমর নায়ক **এণ্টনি** এবং **অকটেভিয়ান** গৃহযুদ্ধে সাধারণতন্ত্রীদের পরাজিত করে রোমের ক্ষমতা দখল করলেন। কিন্তু রোমের উপর একছত্র আধিপত্য নিয়ে এণ্টনি ও অকটেভিয়ানের মধ্যে আবার বিরোধ বাধল। শেষ পর্যন্ত অকটেভিয়ান এণ্টনিকে পরাজিত করে রোমে নিজের প্রাধান্য স্থাপন করেন। এণ্টনি মিশরে পালিয়ে গিয়েও নিস্তার পান নি। সেখানে তিনি নিহত হয়েছিলেন। তারপর অকটেভিয়ান একে একে সিনেট থেকে তাঁর বিরোধী সদস্যদের বিতাড়িত করে নিজের মনোনীত সদস্যদের এনে সিনেটকে নিজের মনের মত করে সাজান এবং এই সাজানো সিনেটের অনুমোদন নিয়ে অকটেভিয়ান **অগাষ্টাস** উপাধি নিয়ে নিজেকে রোমের সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। অগাষ্টাস কথার অর্থ **পবিত্র** তাই অগাষ্টাসের এই নতুন সাম্রাজ্যকে **পবিত্র রোম সাম্রাজ্য**ও বলা হয়।

অগাষ্টাস খ্রীঃ পূঃ ৩০ অব্দ থেকে ১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রোম শাসন করেন। স্বৈরাচারী শাসক হলেও অগাষ্টাসের শাসনকালে রোমের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। তাঁর রাজত্বকালে ঐতিহাসিক **লিভি**, কবি **ভার্জিল**, **হোরেস** এবং **ওভিড** সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। রোম নগরীকে আগষ্টাস শ্বেত পাথরের মন্দির, অট্টালিকা, এম ফি থিয়েটার প্রভৃতি দিয়ে সুশোভিত করেন। এই অগাষ্টাসের রাজত্বকালেই খ্রীষ্টধর্মের প্রবর্তক যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাব হয়েছিল। রোমের ইতিহাসে অগাষ্টাসের রাজত্বকালকে **সুবর্ণযুগ** বলা হয়।

রোম সাম্রাজ্যের পতন ঃ সম্রাট অগাষ্টাসের মৃত্যুর একশ বছরের মধ্যে রোম সাম্রাজ্য প্রায় সমগ্র দক্ষিণ ইউরোপ, মিশর ও আফ্রিকার উত্তর অংশ এবং মেসোপটেমিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

কথিত আছে রোমান সম্রাট ট্রাজান নাকি ভারতবর্ষ অভিযানের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে তিনি সে পরিকল্পনা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। কালক্রমে আভ্যন্তরীণ



গোলযোগ, বিদ্রোহ ও বহিরাগত জাতির চাপ রোম সাম্রাজ্যকে দুর্বল করে তোলে। খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতকে সম্রাট **কনস্টানটাইন** তাঁর রাজধানী **বাইজানটাইনে** নিয়ে আসেন। এই নতুন রাজধানীর

নাম হয় **কনস্টান্টিনোপ্‌ল্‌**। এর ফলে রোম সাম্রাজ্য দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে যায়, পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য ও পূর্ব রোম সাম্রাজ্য। রোমকে কেন্দ্র করে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য ক্রমশ আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতকে বিভিন্ন জার্মান উপজাতি, যেমন – **ফ্রাঙ্ক, ভ্যাণ্ডাল, গথ, ভিসিগথ, লম্বার্ড, অ্যাঙ্গাল, স্যাকসন্‌** প্রভৃতির আক্রমণে রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। কনস্টান্টিনোপলের পূর্ব রোম সাম্রাজ্য অবশ্য আরও শতাব্দী কোন রকমে টিঁকে ছিল।

খ্রীষ্টের আবির্ভাব ও খ্রীষ্টান চার্চ ঃ রোম সাম্রাজ্যের বাইরের জাঁকজমক ও আড়ম্বরের আড়ালে সাধারণ মানুষের জীবন খুব দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। অভিজাত প্রভুদের অত্যাচার, তাদের নৈতিক অধঃপতন, ক্রীতদাসদের বিদ্রোহ, ক্ষমতালোভীদের খণ্ডযুদ্ধ ও হত্যালীলা সাম্রাজ্যের শাসন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটিয়েছিল। তাই সাধারণ মানুষের জীবন হয়ে উঠেছিল অনিশ্চয়তা ভরা। এই অবস্থায় রোমের প্রচলিত দেব-দেবীর প্রতি মানুষের আস্থা কমতে লাগল। এমনি এক সন্ধিক্ষণে প্যালেস্টাইনের এক দরিদ্র ইহুদী পরিবারে যীশু আবির্ভূত হন। এই যীশুর বাণী হতাশাগ্রস্ত মানুষের মনে আশার আলো জ্বালল। তিনি বললেন, ঈশ্বরই জগতের সব কিছুর নিয়ন্তা একমাত্র শাসক ও মানুষের মুক্তিদাতা। আর মানুষের সেবা করলেই ঈশ্বরের সেবা করা হয়। দলে দলে মানুষ যীশুর শিষ্য হতে লাগল। যীশুর বাণী সম্রাটের মহিমাকে খর্ব করল। শাসকরা তাই যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করল। কিন্তু যীশুকে হত্যা করেও তাঁর বাণীকে স্তব্ধ করা গেল না। যীশুর শিষ্যরা ছড়িয়ে পড়লেন বিভিন্ন দিকে। রোম সাম্রাজ্য যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ততদূর পর্যন্ত খ্রীষ্টধর্ম ছড়িয়ে পড়ল। অভিজাতরাও কালক্রমে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে লাগল। কারণ তারাও ক্ষয়িষ্ণু রোম সাম্রাজ্যের নৈরাজ্যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

সাম্রাজ্যের নানা দিকে উপাসনার জন্য প্রতিষ্ঠিত হল চার্চ বা গীর্জা। অভিজাতদের মধ্য থেকে নিযুক্ত হলেন **বিশপ ও পুরোহিত।** রোমের গীর্জার প্রথম বিশপ হলেন **পিটার।** পিটারের পরবর্তী রোমের বিশপদের বলা হয় **পোপ।** ল্যাটিন ভাষায় 'পোপ' কথার অর্থ পিতা অর্থাৎ খ্রীষ্টান জগতের প্রধান। সেই থেকে আজও রোমের পোপ অধিকাংশ খ্রীষ্টান জগতের প্রধান হিসাবে স্বীকৃত। খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টান চার্চের গুরুত্ব ইউরোপ তথা বিশ্ব সভ্যতায় খুব সুদূর প্রসারী হয়েছিল। সেকালের ইউরোপের ক্ষয়িষ্ণু সমাজকে খ্রীষ্টধর্মই বাঁচিয়েছিল।

অনুশীলনী

১। বিষয়মুখী ও মৌখিক প্রশ্ন :

(ক) রোম কোথায় অবস্থিত? (খ) রোম নগরীর প্রতিষ্ঠা কে করেন, কোন্ সময়ে? (গ) কার্থেজ কোথায় অবস্থিত ছিল? (ঘ) রোম ও কার্থেজের যুদ্ধ কি যুদ্ধ নামে পরিচিত? (ঙ) কার্থেজের শ্রেষ্ঠ বীর কে ছিলেন? (চ) প্যাট্রিসিয়ান কারা? (ছ) প্লেবিয়ান কাদের বলা হত? (জ) অলিগার কি কি? (ঝ) রোমের লড়াকু ক্রীতদাসদের কি বলা হত? (ঞ) 'এম ফি থিয়েটার' কি? (ট) রোমের ক্রীতদাস বিদ্রোহের নায়ক কে ছিলেন? (ঠ) রোমের কোথায় প্রথম ক্রীতদাস বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল? (ড) ক্রীতদাস বিদ্রোহের পরিণতি কি হয়েছিল? (ঢ) রোমের কয়েকজন সমরনায়কের নাম কর। (ণ) কে প্রকৃতপক্ষে রোমের সাধারণতন্ত্র শাসনের অবসান ঘটান? (ত) নতুন রোম সাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাট কে? (থ) কোন্ সময়কে রোমের সুবর্ণযুগ বলা হয়? (দ) কনস্টান্টিনোপ্‌ল কে প্রতিষ্ঠা করেন? (ধ) যীশু-খ্রীষ্ট কোন্ সময়ে আবির্ভূত হন? (ন) রোমের প্রথম বিশপ কে ছিলেন? (প) খ্রীষ্টান জগতের প্রধানকে কি বলা হত?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন :

(ক) ইটালির অবস্থান ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। (খ) রোম

নগরীর উদ্ভব সম্পর্কে কি কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল? (গ) রোমের সাথে কার্থেজের বিরোধ বেঁধেছিল কেন? (ঘ) পিউনিক যুদ্ধ কি? এই যুদ্ধের পরিণাম কি? (ঙ) প্লেবিয়ানরা কি ভাবে রোমের নাগরিক অধিকার অর্জন করেছিল? (চ) আদি রোমান সমাজের অর্থনৈতিক জীবন কিরূপ ছিল? (ছ) কন্‌সাল ও সিনেট কি? (জ) রোমে অভিজাততন্ত্রের উদ্ভব কি ভাবে হয়েছিল? (ঝ) রোমের গ্ল্যাডিয়েটরদের জীবন কিরূপ ছিল? (ঞ) ক্রীতদাস বিদ্রোহ কি ভাবে পরাজিত হল? (ট) ক্রীতদাস বিদ্রোহের ফল কি হয়েছিল? (ঠ) জুলিয়াস সীজারকে হত্যা করা হয় কেন? (ড) অগাষ্টাসের কালকে স্বর্ণযুগ বলা হয় কেন? (ঢ) রোম সাম্রাজ্য কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল? (ণ) কোন্ কোন্ বিদেশী জাতি রোমে হানা দিয়েছিল ও কেন? (ত) যীশুখ্রীষ্টের বাণীর সারমর্ম কি? (থ) রোমের দেব-দেবীর প্রতি মানুষের ভক্তি কমে গেল কেন?

৩। **রচনা ভিত্তিক প্রশ্ন :**

(ক) পিউনিক যুদ্ধের বিবরণ দাও। (খ) হানিবল কে ছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে যা জান লেখ। (গ) আদি রোমানদের সমাজ, শাসন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কিরূপ ছিল? (ঘ) প্রাচীন রোমের নাগরিকত্ব বিষয়ে যা জান লেখ। (ঙ) রোমের ক্রীতদাসদের জীবন কিরূপ ছিল? (চ) জুলিয়াস সীজারের কৃতিত্ব আলোচনা কর। (ছ) রোম সাম্রাজ্যের পতনের কারণ লেখ। (জ) যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবের ফল কি হয়েছিল?

৪। চীন

শাং-বংশ ঃ প্রাচীনকালে চীনের হোয়াং-হো নদীর অববাহিকায় অনেক রাজবংশ রাজত্ব করেছে। গোড়ার দিকে শিয়া বংশ চারশ বছরেরও অধিককাল রাজত্ব করেছিলেন। এই শিয়া বংশের পর উল্লেখযোগ্য **শাং বা জিন** বংশের রাজত্ব শুরু আনুমানিক ১৫৫৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। এই শাং-বংশের রাজত্বকাল সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের জ্ঞান খুব অস্পষ্ট। তবে খনন কার্যের ফলে যে সব নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এই বংশের রাজত্বকালেই চীনে তামা ও ব্রোন্‌জের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। তা ছাড়া, এই শাং রাজত্বকালেই দূর দেশে চীনের উপনিবেশ বিস্তার শুরু হয়। শাং আমলে নির্মিত বড় বড় সুদৃশ্য ও কারুকার্যমণ্ডিত অসংখ্য ব্রোন্‌জের পাত্র পাওয়া গেছে। শাং আমলে রেশম শিল্পেরও খুব উন্নতি ঘটেছিল। এ সবই শাং আমলের উন্নত শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। এ আমলে যে লোকেরা লেখা-পড়ার চর্চা করত এবং তারা যে লিপির ব্যবহার জানত, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তখনকার ব্রোন্‌জ পাত্রের গায়ে ও হাড়ের উপর খোদাই করা লিপি থেকে।

প্রায় পাঁচশ বছর ধরে শাং-বংশের রাজারা তাঁদের উপনিবেশ ও রাজ্য সীমা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। পরবর্তীকালে শাং রাজাদের উপনিবেশগুলি রাজাকে উপেক্ষা করে একে একে স্বাধীন হয়ে যেতে থাকে। কালক্রমে আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি এবং শাং রাজাদের নৈতিক অবনতির ফলে রাজাদের প্রতি প্রজারা অসন্তুষ্ট হয়। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে চৌ-বংশের একজন রাজা শাং-বংশের রাজাকে অপসারিত করে সিংহাসন দখল করেন।

চৌ-বংশ ঃ চৌ-বংশ চীনে প্রায় নয়শ বছর রাজত্ব করেন। চৌ-বংশের রাজত্বকালেই চীনে প্রথম সুনিয়ন্ত্রিত শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এই যুগেই চীনের প্রসিদ্ধ দার্শনিক **কনফুসিয়াস** আবির্ভূত হয়েছিলেন।

কনফুসিয়াস ঃ খ্রীষ্টপূর্ব ৫৫১ অব্দে চীনের 'লু' প্রদেশে কনফুসিয়াস জন্মগ্রহণ করেন। এই 'লু' প্রদেশ ছিল আধুনিক শানটুং প্রদেশের অন্তর্গত। শৈশবে কনফুসিয়াস তাঁর পিতাকে হারান। তাঁর মা তাঁকে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করেন। বড় হয়ে কনফুসিয়াস ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য একটি বিদ্যালয় খোলেন। লেখাপড়ার প্রতি তাঁর ছিল অপরিসীম আগ্রহ। রাজধানী শানটুং-এ রাজার খুব বড় একটি গ্রন্থাগার ছিল। সেখানে গিয়ে কনফুসিয়াস খুব মনযোগ দিয়ে গ্রন্থাগারটি দেখলেন। গ্রন্থাগারের বইগুলি কিন্তু এখানকার মত কাগজে ছাপা ছিল না। বই-এর পাতাগুলি ছিল বাঁশের ছালের উপর তুলি দিয়ে লেখা। সেখানে কনফুসিয়াস গভীর মনোযোগ দিয়ে ইতিহাসের সব বইগুলি পড়ে ফেললেন। তারপর তিনি দেশে ফিরে এলেন। তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে 'লু প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হল।



কনফুসিয়াস

কনফুসিয়াস চীনবাসীকে ভদ্র ও সভ্য আচার ব্যবহার শেখানোর জন্য কতকগুলি নিয়মকানুন তৈরী করলেন। চীনবাসীর চরিত্র, স্বভাব ও নৈতিক মানকে উন্নত করার জন্য তিনি খুব গুরুত্ব দেন। তিনি বলতেন, 'অন্যের কাছ থেকে যে ব্যবহার তুমি পেতে চাও না, তুমিও অপরের সাথে কখনও সেরূপ ব্যবহার করবে না।' জগতের নানারকম বিশৃঙ্খলা, অশান্তি ও মানুষের দুঃখ দুর্দশা নিয়ে তিনি খুব চিন্তা করতেন, তিনি সব সময় মানুষকে মহান করতে চাইতেন। উত্তর চীন ও হোয়াং-হো অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ এখনও কনফুসিয়াসের মতবাদ ও আদর্শ মেনে চলে।

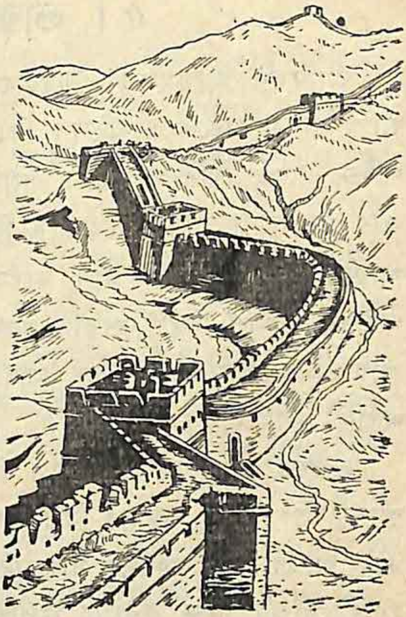
কন্‌ফুসিয়াস কোন ধর্মীয় মতবাদ প্রচার করেন নি, তিনি ছিলেন খুব বাস্তববাদী ও নীতিবাদী একজন রাজনীতিজ্ঞ। কন্‌ফুসিয়াস সারা জীবন ধরে এমন একজন রাজপুত্রকে খুঁজেছিলেন, যে তাঁর আদর্শ-গুলিকে কার্যকরী করতে পারে। কিন্তু তিনি তেমন রাজপুত্রের সন্ধান পান নি। শেষ বয়সে তিনি ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন। এই দিক থেকে বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর সাথে তাঁর অনেকটা মিল আছে।

চীন বংশঃ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে চৌ রাজবংশ দুর্বল হয়ে পড়ে। দীর্ঘ চৌ আমলে চীন খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যায়। হুনদের মত একজাতের লোক এসে ছোট ছোট নগর গড়ে তুলল। স্থানীয় শাসকরা কর দেওয়া বন্ধ করে দিল। এই সময়ে চীনে পাঁচ কি ছয় হাজার প্রায়-স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। এই কালকে চীনের **বিশৃঙ্খলার যুগ** বলা হয়। এরপর **চীন** বংশের রাজত্ব শুরু হয়। এই বংশের নাম থেকেই দেশটার নাম হয়েছে চীন। চীন বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন **শি-হুয়াং-তি**। ইনিই ছিলেন চীন দেশের প্রথম **বিশ্বজনীন সম্রাট**।

শি-হুয়াং-তির রাজত্বকালে চীন দেশ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমৃদ্ধির এক নতুন যুগের সূচনা করে। শি-হুয়াং-তি তাঁর পূর্ববর্তী রাজাদের কোন কীর্তিকেই স্বীকার করেননি। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী রাজাদের আমলের লেখা সমস্ত ইতিহাস বই পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। দেশের পণ্ডিত ব্যক্তিরা ভাল ভাল বইগুলি সব লুকিয়ে ফেলেছিলেন বলে সেগুলি রক্ষা পেয়েছিল।

চীনের প্রাচীরঃ চীনের উত্তরদিক থেকে আসা মরুবাসী হুন-জাতীয় আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে শি-হুয়াং-তি প্রবল ভাবে যুদ্ধ করেন এবং তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য তিনি চীনে এক প্রাচীর নির্মাণের কাজ শুরু করেন। চীনের উত্তর দিকে মাঙ্গোলিয়ার

সীমান্ত ধরে সমুদ্র পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার মাইল লম্বা বিখ্যাত এই প্রাচীরটি পৃথিবীর আর এক আশ্চর্য বস্তু। প্রাচীরটি উচ্চতায় ২৫ ফুট আর এটা এত চড়া যে এর উপর দিয়ে ছয়জন অশ্বারোহী একসাথে পাশাপাশি যেতে পারে। আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২১৪ অব্দে এই প্রাচীরের নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং শেষ হতে কয়েক শতাব্দী সময় লাগে। চীন বংশের রাজত্ব কালের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি এই চীনের প্রাচীর।



চীনের প্রাচীর

অনুশীলনী

১। বিষয়মুখী ও মৌখিক প্রশ্ন :

(ক) শাং-বংশের রাজত্ব কোন্ সময়ে শুরু হয় ? (খ) শাং-বংশ কত বছর রাজত্ব করে ? (গ) চৌ-বংশ কত বছর রাজত্ব করেছিল ? (ঘ) কোন্ বংশের রাজত্বকালে কন্‌ফুসিয়াস আবির্ভূত হন ? (চ) চীন বংশের উল্লেখযোগ্য কীর্তি কি ? ছ) চীন দেশের নাম চীন হয় কেন ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন :

(ক) শাং রাজত্বকালে চীনের কি উন্নতি হয়েছিল ? (খ) কন্‌ফুসিয়াসের শিক্ষা কি ? (গ) চীনের বিশৃঙ্খলার যুগ কাকে বলা হয় ? (ঘ) চীনের প্রাচীর কেন নির্মিত হয়েছিল ?

৩। রচনা ভিত্তিক প্রশ্ন :

(ক) কন্‌ফুসিয়াস কে ছিলেন ? তাঁর সম্বন্ধে যা জান লেখ।

(খ) বিখ্যাত চীনের প্রাচীর সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৫। ভারত

আর্যদের আগমন ঃ খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে আর্যরা ভারতে এসেছিল। তারা এসেছিল ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিকের গিরিপথ দিয়ে। আর্যরা কোন্ দেশ থেকে এসেছিল আর তাদের বাসস্থান যে কোথায় ছিল তা নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। তবে অনেকে মনে করেন বর্তমান রুশ দেশের **উড়াল** পর্বতের দক্ষিণে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি অঞ্চল ছিল আর্যদের আদি নিবাস। আর ভারতবর্ষে আসার আগে আর্যরা হয়ত পারস্য দেশে কয়েক শতাব্দী কাটিয়েছিল।

ভারতে এসে আর্যরা প্রথমে সিন্ধু নদের তীরে তাদের বসতি স্থাপন করে। সে কালের সিন্ধু অঞ্চলে সাতটি নদীর প্রবাহ ছিল। তাই আর্যরা এই অঞ্চলের নাম দিয়েছিল **সপ্তসিন্ধু**। হয়ত এই সিন্ধু থেকেই **হিন্দু** কথাটির উৎপত্তি হয়েছে। কালক্রমে এই সিন্ধু অঞ্চল থেকে আর্যরা ক্রমশ পূর্বদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং সারা উত্তর ভারতেই তাদের বসতি বিস্তার করে। তারপর এক সময় বিন্ধ্য পর্বত পার হয়ে আর্যরা সুদূর দক্ষিণ ভারতেও নিজেদের প্রধান্য স্থাপন করেছিল। সেকালে ভারতের উত্তর অংশকে বলা হত **আর্যাবর্ত** আর বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ অংশকে বলা হত **দাক্ষিণাত্য**।

বেদ ঃ আর্যদের প্রাচীনতম গ্রন্থের নাম **বেদ**। বিদ কথার অর্থ **জ্ঞান**। এই 'বিদ' কথা থেকেই 'বেদ' কথাটি উৎপত্তি হয়েছে। বেদ চার প্রকার—**ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ,** ও **অথর্ববেদ**। এদের মধ্যে ঋগ্বেদই সর্ব প্রাচীন। প্রত্যেক বেদের আবার চারটি করে অংশ, যথা—**ব্রাহ্মণ, সংহিতা, আরণ্যক** ও **উপনিষদ**। এই সব নিয়েই রচিত হয়েছে বৈদিক সাহিত্য। আর্যদের ধারণা বেদ কোন মানুষের **সৃষ্টি** নয়। ভগবানের মুখ-নিঃসৃত বাণী কানে শুনে বেদ লিখিত হয়েছিল। তাই বেদের অপর নাম **শ্রুতি**।

বৈদিক সাহিত্য পাঠ করে আর্যদের সমাজ, ধর্ম ও রাজনৈতিক জীবনের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়।

সমাজ ঃ বৈদিক যুগে আর্যদের সমাজ ছিল পরিবার কেন্দ্রিক। পরিবারের কর্তা ছিলেন পিতা। পিতার নির্দেশ পরিবারের সকলে মান্য করত। যারা আর্য ভাষায় কথা না বলত, আর্যরা তাদের হীন চোখে দেখত। মানুষের বৃত্তি হিসাবে বৈদিক যুগের সমাজ চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—**ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র**। ব্রাহ্মণরা যাগযজ্ঞ ও ধর্মচর্চা নিয়ে থাকতেন, ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজ্য শাসন নিয়ে থাকতেন, বৈশ্যরা কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে থাকতেন আর শূদ্রদের স্থান ছিল সমাজের সকলের নীচে। তারা অপর সকল শ্রেণীর সেবা করত। তাই শূদ্রদের ছিল ক্রীতদাসের জীবন।

বৈদিক যুগে আর্য নারীর স্থান খুব উচ্চে ছিল। সংসারের বাইরেও তাঁরা পুরুষের সাথে অনেক কাজ করতেন। তাঁরাও লেখা পড়া এবং শাস্ত্রচর্চা করতেন। বৈদিক যুগের অনেক বিদুষী নারীর নাম জানা যায়। তাঁদের মধ্যে **ঘোষা, অপালা, লোপামুদ্রার** নাম উল্লেখযোগ্য।

বৈদিক সমাজে ব্যক্তি জীবন চারটি স্তর বা আশ্রমে বিভক্ত ছিল—**ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস**। একে বলা হয় **চতুরাশ্রম**। ব্রহ্মচর্য আশ্রমে আর্য বালক গুরুগৃহে থেকে কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা পালনের মধ্য দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করত। শিক্ষা সমাপ্ত হলে সে গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করে সংসার-ধর্ম পালন করত। বৃদ্ধ বয়সে সংসার ত্যাগ করে সে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করত। তারপর শুরু হত তার সন্ন্যাস জীবন।

বৈদিক যুগের শেষের দিকে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। বৈশ্য, শূদ্রদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বিরোধী মনোভাব দেখা দেয় এবং জাতিভেদ প্রথা ক্রমশ কঠোর হয়ে ওঠে।

ধর্ম ঃ বৈদিক সাহিত্যে দেখা যায় আর্যরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে দেব-দেবী রূপে উপাসনা করত। এ সব দেব-দেবীর মধ্যে **সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, বরুণ, বজ্র, মরুৎ, অগ্নি, উষা** প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সে যুগে মূর্তি-পূজার প্রচলন ছিল না। দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে পশুবলি দেওয়া হত এবং অগ্নিতে খাদ্যদ্রব্য আহুতি দিয়ে উপাসনা করা হত।

রাজনৈতিক জীবন ঃ বৈদিক যুগে আর্যদের রাজনৈতিক জীবনের ভিত্তি ছিল পরিবার। কতকগুলি পরিবার নিয়ে গঠিত হত একটি **গোত্র**, কতকগুলি গোত্রের সমন্বয়ে গঠিত হত একটি বিশ আর কতকগুলি বিশ নিয়ে গঠিত হত একটি **গোষ্ঠী**। ঋগ্বেদে এরকম অনেকগুলি গোষ্ঠীর উল্লেখ আছে। দেশ শাসনের কাজে সকলের উপরে ছিলেন **রাজন** বা **রাজা**। রাজপদ বংশানুক্রমিক ছিল আবার কখনও কখনও রাজা নির্বাচিতও হতেন। রাজার ক্ষমতা **সভা** ও **সমিতি** নামে দুটি পরিষদের দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। বৈদিক যুগের শেষের দিকে রাজাদের ক্ষমতা খুব প্রবল হয়ে উঠেছিল। তাঁরা **'একরাট'** বা **'সম্রাট'** উপাধি নিয়ে বিশাল ভূ-ভাগের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপনে প্রয়াসী হতেন। উল্লেখযোগ্য রাজকর্মচারীদের মধ্যে **গ্রামনী, সেনানী** প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। আর সে যুগের রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে পুরোহিতদের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল।

অর্থনৈতিক জীবন ঃ কৃষি ও পশুপালনই ছিল বৈদিক যুগের আর্যদের প্রধান জীবিকা। কৃষির প্রসারের সাথে সাথে নানা রকম কারিগরী কাজকর্মও আরম্ভ হয়। সূতী ও পশমী বস্ত্র বয়ন, অলঙ্কার প্রস্তুত, গৃহস্থালীর উপযোগী নানারকম আসবাব, বাসন-কোসন ইত্যাদি প্রস্তুতেও সেকালের কারিগরদের যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিনিময়ের মাধ্যমে সেকালে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। বিনিময়ের মাধ্যম ছিল গরু। পরবর্তীকালে 'নিস্ক' নামে এক প্রকার স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলন হয়।

মহাকাব্য ঃ বৈদিক যুগের শেষ দিকে **রামায়ণ** ও **মহাভারত** নামে দুখানি মহকাব্য রচিত হয়েছিল। রামায়ণ রচনা করেছিলেন

বাল্মীকিমুনি আর মহাভারত রচনা করেছিলেন **ব্যাসদেব**। শ্রীরামচন্দ্রের সাথে লঙ্কার রাজা রাবণের যুদ্ধের কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছিল রামায়ণ, আর রাজ্যের অধিকার নিয়ে জ্ঞাতি ভাই কুরু ও পাণ্ডবদের মধ্যে কুরুক্ষেত্রের যে ভীষণ যুদ্ধ হয়—তাই নিয়ে রচিত হয়েছিল মহাভারত। এই মহাকাব্য দুখানি থেকে সে যুগের সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ে অনেক মূল্যবান তথ্য জানা যায়। এ ছাড়া আদর্শ রাজধর্ম, সত্যনিষ্ঠা, ভ্রাতৃপ্রেম প্রভৃতি বিষয়ে অনেক শিক্ষনীয় আদর্শ রয়েছে এই মহাকাব্য দুখানিতে। ভারতীয় সমাজে রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক প্রভাব রয়েছে। রামায়ণ ও মহাভারতকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের প্রামাণ্য দলিল হিসাবে গণ্য করা যায়। মহাকাব্য দুখানিতে যে যুগের কথা বর্ণিত হয়েছে সে যুগকে **মহাকাব্যের যুগ** বলা হয়।

মহাবীর ও বুদ্ধ

বৈদিক যুগের শেষের দিকে ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে নানা রকম জটিলতা, সংকীর্ণতা ও কঠোরতা দেখা দিল। জাতিভেদ প্রথাও যেমন কঠোর হয়ে এল অন্যান্য শ্রেণীর উপর ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের অত্যাচার ও জুলুম তত বেড়ে উঠল। ফলে শুরু হল বেদ ও ব্রাহ্মণ বিরোধী আন্দোলন। এই আন্দোলনের ফল হিসাবেই সেকালে **জৈন** ও **বৌদ্ধ** ধর্মের উদ্ভব হল। ব্রাহ্মণ ছাড়া আর সকল শ্রেণীই জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মকে সমর্থন করল। জৈন ধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন **মহাবীর** আর বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন **গৌতমবুদ্ধ**।

মহাবীর ঃ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বিহারের বৈশালীতে এক সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয় পরিবারে মহাবীরের জন্ম হয়। তাঁর পিতা ও মাতার নাম ছিল সিদ্ধার্থ ও ত্রিশলা। মহাবীরের বাল্য নাম ছিল বর্ধমান। মহাবীর ত্রিশ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করেন এবং বার বছর কঠোর তপস্যা করার পর তিনি পরেশনাথ পাহাড়ের পাদদেশে ধ্যানে বসে

সিদ্ধি লাভ করেন। কঠোর তপস্যা দ্বারা তিনি ইন্দ্রিয়কে জয় করে জিন্ হয়েছিলেন। তাই তাঁর ধর্মমত জৈনধর্ম নামে পরিচিত। সিদ্ধিলাভ করার পর মহাবীর বিদেহ, মগধ, অঙ্গ প্রভৃতি দেশে তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন। অবশেষে খ্রীষ্টপূর্ব ৪৬৮ অব্দে তিনি বিহারের পাবাপুরিতে দেহত্যাগ করেন।



মহাবীর

জৈনধর্মের সার কথা: জৈনদের মতে মহাবীরের আগে জৈনধর্মের তেইশজন তীর্থঙ্কর বা ধর্মগুরু ছিলেন। তেইশতম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ আর চব্বিশতম ও শেষ তীর্থঙ্কর ছিলেন মহাবীর। মহাবীর তাঁর পূর্ববর্তী তীর্থঙ্করদের ধর্মমতের সংস্কার করেছিলেন মাত্র। পার্শ্বনাথ তাঁর শিষ্যদের চারটি উপদেশ পালন করতে বলেছিলেন—মিথ্যা কথা না বলা, জীবে হিংসা না করা, চুরি না করা, বিষয়ের প্রতি আসক্তি না রাখা। পার্শ্বনাথের এই চারটি উপদেশকে **চতুর্যাম** বলা হয়। মহাবীর এর সাথে আরও একটি উপদেশ যোগ করেন, তা হল, ইন্দ্রিয়কে জয় করা। জৈনধর্ম মতে মানুষ কর্মফল ভোগ করার জন্য পুনর্জন্ম লাভ করে। এই পুনর্জন্ম থেকে মুক্তির উপায় কঠোর তপস্যা করা।

পরবর্তীকালে জৈনধর্মাবলম্বীরা **শ্বেতাম্বর** ও **দিগম্বর** এই দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় শ্বেতবস্ত্র পরিধান করেন আর দিগম্বর সম্প্রদায় কোন বস্ত্র পরিধান করেন না। জৈন ধর্মগ্রন্থের মধ্যে **অঙ্গ, উপাঙ্গ, মূল, সূত্র** প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে জৈনদের মধ্যে হিন্দু দেব-দেবী গণেশ ও লক্ষ্মী পূজার প্রচলন হয়।

গৌতম বুদ্ধ ঃ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে নেপালের তরাই অঞ্চলের কপিলাবস্তুতে সম্ভ্রান্ত শাক্য বংশে গৌতম বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শুদ্ধোধন এবং মাতার নাম মায়া দেবী। গৌতমের বাল্য নাম ছিল সিদ্ধার্থ। সিদ্ধার্থ খুব ছোট বেলায় তাঁর মাকে হারান। তখন তাঁর মাসী গৌতমী তাঁকে লালন পালন করেন। তাই তাঁর নাম হয় গৌতম। রাজার তনয় হয়েও ভোগ বিলাসিতার প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না। ছোট বেলা থেকেই তিনি ছিলেন খুব চিন্তাশীল। মানুষ জরা, ব্যাধি, মৃত্যুতে কষ্ট পায় দেখে তাঁর মন খুব ব্যথিত হত। তিনি কেবলই ভাবতেন মানুষের এই কষ্ট থেকে মুক্তি কিসে। মাত্র ২৯ বছর বয়সে পুত্র রাহুল এবং স্ত্রী গোপাকে রেখে গৌতম সংসার ত্যাগ করেন। সংসার ত্যাগ করে তিনি মানুষের মুক্তি-পথের সন্ধানে নানা স্থানে ঘুরে বেড়ালেন, অনেক তপস্যা করলেন; কিন্তু মুক্তির সন্ধান পেলেন না। অবশেষে গয়ার কাছে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে এক বটবৃক্ষের নীচে গভীর ধ্যানে বসে গৌতম দিব্যজ্ঞান লাভ করলেন। দিব্যজ্ঞান লাভ করে তাঁর নাম হল বুদ্ধ। বুদ্ধ কথার অর্থ জ্ঞানী। যে বৃক্ষের তলায় বসে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করলেন সেই বৃক্ষের নাম হল বোধিদ্রুম। এর পর কাশীর কাছে সারনাথে বুদ্ধ প্রথম তাঁর ধর্মপ্রচার শুরু করেন। মগধ, কোশল, বৈশালী, রাজগৃহ প্রভৃতি স্থান বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। সেকালের অনেক বড় বড় রাজা যেমন—বিম্বিসার, অজাতশত্রু, প্রসেনজিৎ প্রমুখ বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। দীর্ঘকাল ধর্ম প্রচার করার পর ৮০ বছর বয়সে কুশীনগরে তিনি মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।



গৌতম বুদ্ধ

বৌদ্ধধর্মের সারকথা ঃ বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়েছে। বুদ্ধদেব বলেছেন পৃথিবীতে দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখ দূর করার প্রয়োজন আছে এবং দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় আছে। মুক্তির উপায় হিসাবে তিনি আটটি পথের সন্ধান দিয়েছেন। এই আটটি পথ হল—সৎস্মৃতি, সৎবাক্য, সৎজীবন, সৎদৃষ্টি, সৎচেষ্টা, সৎকর্ম, সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সমাধি। এই আটটি পথকে এক কথায় **অষ্টাঙ্গিক মার্গ** বলা হয়। বুদ্ধদেব এই আটটি পথ ছাড়াও আরও চারটি নিয়ম মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন, তা হল—হিংসা না করা, চুরি না করা, কোন কিছুর প্রতি আসক্তি না রাখা ও মিথ্যা কথা না বলা।

গৌতম বুদ্ধ শিষ্যদের নিয়ে বৌদ্ধ সংঘ বা মঠ গড়ে তুলেছিলেন। **ত্রিপিটক** নামক গ্রন্থে বুদ্ধের বাণীগুলি লিপিবদ্ধ আছে। কালক্রমে বৌদ্ধ ধর্মে নানা মত দেখা দেয় এবং বৌদ্ধগণ হীনযান ও মহাযান প্রভৃতি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েন। জৈনধর্ম অপেক্ষা বৌদ্ধধর্ম অনেক বেশী প্রসার লাভ করেছিল। ভারতের বাইরে চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, জাভা প্রভৃতি দেশের অধিকাংশ মানুষই বৌদ্ধধর্মালম্বী।

অখণ্ড সাম্রাজ্য স্থাপন

বৈদিক যুগ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের মধ্যে ভারতবর্ষে অনেকগুলি **মহাজনপদ** বা রাজ্য গড়ে উঠেছিল। জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থগুলিতে এরকম ষোলটি মহাজনপদের উল্লেখ আছে। মহাজনপদগুলির মধ্যে নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। গাঙ্গেয় উপত্যকার সমৃদ্ধশালী অঞ্চলের উপর একাধিপত্য স্থাপনের জন্য কয়েক শতাব্দী ধরে চলেছিল এই যুদ্ধবিগ্রহ। শেষ পর্যন্ত একে অপরকে গ্রাস করে চারটি মহাজনপদ খুব শক্তিশালী হয়ে উঠল। এই চারটি মহাজনপদ হল কাশী, কোশল, বৃজি ও মগধ। এর পর আরও একশ বছর ধরে এই চারটি মহাজনপদের মধ্যে লড়াই চলল এবং শেষ পর্যন্ত

মগধ জয়ী হল। উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকা জুড়ে মগধের প্রাধান্য স্থাপিত হল।

মগধের প্রাধান্য স্থাপিত হয় হর্যঙ্ক বংশের বিম্বিসারের আমল থেকে। পরপর কয়েকটি রাজবংশ মগধে রাজত্ব করেন, যেমন— হর্যঙ্ক বংশ, শিশুনাগ বংশ এবং নন্দ বংশ।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ঃ এই নন্দবংশের শেষ রাজা **ধননন্দকে** পরাজিত করে খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৪ অব্দে **চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য** মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কেউ কেউ বলেন চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন মুরা নামে এক দাসীর পুত্র। তাই তাঁর বংশ মৌর্য বংশ নামে পরিচিত। আবার কেউ বলেন, নেপালের তরাই অঞ্চলের 'মোরিয়' নামে এক ময়ূর পালক বংশের সন্তান ছিলেন বলে চন্দ্রগুপ্তের বংশ মৌর্য বংশ নামে পরিচিত। কৌটিল্য বা চাণক্য নামে এক ব্রাহ্মণের সহায়তায় তিনি মগধের সিংহাসন দখল করেন।

সিংহাসনে আরোহণ করার পর চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক সেনাপতি সেলুকাসকে পরাজিত করে পাঞ্জাব থেকে গ্রীক শাসনের অবসান ঘটান। চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য কাবুল থেকে মহীশূর এবং সৌরাষ্ট্র থেকে বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কেবল সাম্রাজ্য বিস্তার করেই চন্দ্রগুপ্ত ক্ষান্ত থাকেন নি, তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যে এক সুন্দর শাসন ব্যবস্থাও স্থাপন করেন। তাঁর রাজত্বকালে গ্রীক দূত **মেগাস্থিনিস** ভারত পর্যটনে এসেছিলেন। তিনি চন্দ্রগুপ্তের শাসন ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন। শেষ জীবনে চন্দ্রগুপ্ত জৈনধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং খ্রীঃ পূঃ ৩০০ অব্দে তিনি মহীশূরের কাছে শ্রবণ-বেলগোলা নামক স্থানে উপবাসে দেহত্যাগ করেন।

বিন্দুসার ঃ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বিন্দুসার মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিন্দুসার তাঁর পিতার সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন এবং তিনি **অমিত্রাঘাত** উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।


মৌর্য সাম্রাজ্য
স্কেল
০ ৪৮৩
কি.মি.
কাবুল
তক্ষশিলা
কাশ্মীর
তোপরা
মীরাট
ইন্দ্রপ্রস্থ
শ্রাবস্তী
কপিলাবস্তু
ললিত পাটন
(কাঠমণ্ডু)
বৈরাট
মথুরা
বৈশালী
পাটলিপুত্র
ব্রহ্মপুত্র
প্রয়াগ
মগধ
চম্পা
অঙ্গ
কামরূপ
সাঁচি
সৌরাষ্ট্র
গিরনার
নর্মদা
তাম্রলিপ্তি
কলিঙ্গ
অন্ধ্র
আরব
সাগর
বঙ্গোপসাগর
নেলোর
চোল
অনুশাসনসমূহ
প্রাপ্তির স্থান
শিলালিপি — ▲
স্তম্ভলিপি — ×
তাম্রপর্ণী
ভারত মহাসাগর

অশোক

বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অশোক আনুমানিক ২৭৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতা ও পিতামহের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অশোক কলিঙ্গ রাজ্যটি জয় করেন। কলিঙ্গ যুদ্ধে বিপুল হতাহত ও রক্তপাত দেখে অশোক গভীর ভাবে মর্মাহত হন। তাঁর মনে তীব্র অনুশোচনা জাগে। তাই তিনি অস্ত্র ত্যাগ করে বুদ্ধের অহিংস বাণী গ্রহণ করেন এবং বৌদ্ধধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী দেশ শাসনে ব্রতী হন।



অশোক

অশোক প্রজাদের নিজের সন্তান তুল্য জ্ঞান করতেন। প্রজাদের উপর যাতে কোন অত্যাচার না হয় সে জন্য তিনি বিশেষ ধরণের রাজকর্মচারী নিয়োগ করেন। সাম্রাজ্যের সর্বত্র তিনি প্রশস্ত রাজপথ, অথিতিশালা, চিকিৎসালয় স্থাপন এবং বৃক্ষ রোপণ ও কূপ খনন ক'রে প্রজাদের অশেষ কল্যাণ সাধন করেছিলেন। প্রজাদের সুবিধার জন্য তিনি বুদ্ধের বাণীগুলি শিলাস্তম্ভে এবং পাহাড়ের গায়ে খোদিত করেন। ভারতের বাইরে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের জন্য অশোক পশ্চিম-এশিয়ার দেশগুলিতে এবং সিংহলে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেন। বিশাল সাম্রাজ্যের অধিশ্বর হয়েও সম্রাট অশোক যুদ্ধ জয়ের পথ ত্যাগ করে ধর্ম বিজয়ের পথ গ্রহণ করেছিলেন। তাই তিনি **মহামতি অশোক** নামে পরিচিত। আনুমানিক ২৩৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে অশোকের মৃত্যু হয়।

অশোকের মৃত্যুর অল্পকালের মধ্যেই মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন হয়।

মৌর্যযুগের অবসানের পর উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাকট্রিয় ও পার্থীয় গ্রীকগণ এবং তারপর শকগণ কিছুকাল রাজত্ব করেন। তারপর খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে উত্তরভারতে কুষাণগণ প্রভূত্ব স্থাপন করেন। চীনের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের ইউ-চি জাতির একটি শাখা কুষাণ নামে পরিচিত। কুষাণদের নেতা কুজল কদ্‌ফিস কাবুল ও কাশ্মীরে নিজ আধিপত্য স্থাপন করেন। তাঁর পুত্র বিমকদ্‌ফিসের পর সিংহাসনে আরোহণ করেন কণিষ্ক।

কণিষ্ক

কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন কণিষ্ক। তিনি খ্রীষ্টীয় ৭৮ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি কাবুল, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, মালব, রাজপুতনা, কাথিয়াবার প্রভৃতি অঞ্চল পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। চীনের সেনাপতি প্যানচাওকে যুদ্ধে পরাজিত করে কণিষ্ক মধ্য-এশিয়ার খাসগর, খোটান প্রভৃতি অঞ্চল জয় করেছিলেন। পুরুষপুর বা পেশোয়ারে তিনি তাঁর রাজধানী স্থাপন করেছিলেন।

—নানা কারণে কণিষ্কের রাজত্বকাল ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি ৭৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শকাব্দ নামে একটি নতুন সম্বৎ প্রবর্তন করেছিলেন। কণিষ্ক ছিলেন বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক। তিনি কাশ্মীরে একটি বৌদ্ধ ধর্ম মহাসম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। তাঁর সময়েই বৌদ্ধগণ হীনযান ও মহাযান এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়। এ সব ছাড়াও কণিষ্কের রাজত্বকালে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রভুত উন্নতি হয়েছিল।

গুপ্ত বংশ

কুষাণ যুগের অবসানের পর কয়েক শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষে শক্তিশালী কোন কেন্দ্রীয় শাসন ছিল না। ফলে এই কয়েক

শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষে প্রায় অন্ধকার যুগ চলে। অবশেষে খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতকের প্রথম দিকে উত্তরভারতে গুপ্ত বংশীয় রাজগণ ক্রমশ পরাক্রমশালী হয়ে ওঠেন। গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠা করেন **শ্রীগুপ্ত**। এই বংশের প্রথম পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন **প্রথম চন্দ্রগুপ্ত**। তিনি ৩২০ খ্রীষ্টাব্দে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অযোধ্যা ও এলাহাবাদ পর্যন্ত তাঁর রাজ্য সীমা বিস্তৃত ছিল। পাটলিপুত্র ছিল তাঁর রাজধানী। লিচ্ছবী রাজকন্যা কুমার দেবীকে বিবাহ করে তিনি তাঁর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন।

সমুদ্র গুপ্ত ঃ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র সমুদ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সমুদ্রগুপ্তকে গুপ্ত-বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলা হয়। তিনি উত্তরভারতের রুদ্রদেব, নাগদত্ত, নাগসেন, মতিল প্রমুখ নয়জন রাজাকে পরাজিত করে প্রায় সমগ্র উত্তরভারত নিজ সাম্রাজ্য ভুক্ত করেন। তারপর তিনি মধ্যভারতের অরণ্য রাজ্যগুলি জয় করে দক্ষিণভারত অভিযান করেন। উড়িষ্যা থেকে কাঞ্চী পর্যন্ত অভিযান করে সমুদ্রগুপ্ত বিষ্ণুগোপ, মহেন্দ্র, ব্যাঘ্ররাজ, স্বামীদত প্রমুখ দক্ষিণভারতীয় রাজন্যবর্গকে পরাজিত করেন। তবে দক্ষিণভারতের রাজগণ তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নিলে সমুদ্রগুপ্ত তাঁদের রাজ্যগুলি ফিরিয়ে দেন। এরপর সমুদ্রগুপ্ত ভারতের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত সমতট, দবাক, কামরূপ জয় করেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতের গণতন্ত্র শাসিত রাজ্যগুলিও তার প্রাধান্য স্বীকার করে নেয়। সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে নর্মদা নদী এবং পশ্চিমে যমুনা নদী থেকে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।



সমুদ্রগুপ্ত

সমুদ্রগুপ্ত কেবল দিগ্বিজয়ী বীরই ছিলেন না, তিনি একজন

সুদক্ষ শাসক, বিদ্যোৎসাহী ও সঙ্গীতানুরাগী সম্রাট ছিলেন। গুপ্ত-যুগের বিখ্যাত কবি হরিষেণ ছিলেন তাঁর সভা কবি।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (বিক্রমাদিত্য) ঃ সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত আনুমানিক ৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করেছিলেন। তা ছাড়া পশ্চিমভারতের শকগণকে দমন করে তিনি **শকারি** উপাধিও গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সৌরাষ্ট্র, মালব ও গুজরাট জয় করেছিলেন। তিনি **উজ্জয়িনীতে** তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্তের রাজ সভায় নয়জন মহাপণ্ডিতের সমাবেশ হয়েছিল। তাঁর এই নবরত্ন সভার মধ্যমণি ছিলেন **মহাকবি কালিদাস**। তাঁর রাজত্বকালেই চীন দেশের পরিব্রাজক **ফা-হিয়েন** ভারতবর্ষে এসেছিলেন। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে গুপ্তযুগ ছিল প্রাচীন ভারতের স্বুবর্ণ যুগ।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর (৪১৩ খ্রীঃ) পর গুপ্ত সাম্রাজ্য ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। আভ্যন্তরীণ কলহ ও বিদ্রোহের ফলে অঙ্গ রাজ্য-গুলি একে একে স্বাধীন হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত হুন জাতির আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। **নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্যই** ছিলেন গুপ্ত বংশের শেষ পরাক্রান্ত সম্রাট। তিনি হুন নেতা **মিহিরগুলকে** পরাজিত করেছিলেন। ৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে নরসিংহ গুপ্তের মৃত্যুর পরই গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবসান হয়।

প্রাচীন বাংলার ইতিহাস

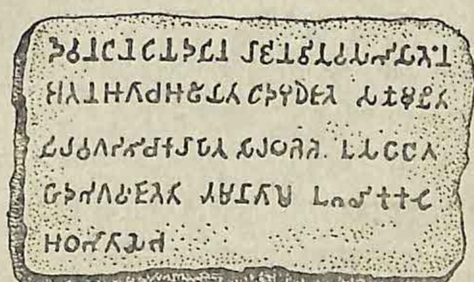
দেশ পরিচয় ঃ প্রাচীনকালে বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। উত্তরবঙ্গ—**পুণ্ড্র** ও **বরেন্দ্র**, পশ্চিমবঙ্গ—**রাঢ়** ও **তাম্রলিপ্ত** এবং দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ— **সমতট, হরিকেল, বঙ্গাল** প্রভৃতি নামেও পরিচিত ছিল। এ ছাড়া উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের কতকাংশ গৌড় নামে সুপরিচিত ছিল।

প্রাচীনকালে বাংলাদেশের সীমার কোন স্থিরতা ছিল না। রাজনৈতিক কারণে তার সীমা বারবার বদল হয়েছে। তবে মোটামুটি ভাবে বলা যায়, উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও পশ্চিমে গঙ্গানদী ও রাজমহল পর্বত বেষ্টিত বিরাট ভূ-ভাগটাই ছিল প্রাচীন বাংলাদেশ।

প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থ, শিলালিপি ও বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণে বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন নামে প্রাচীন বাংলাদেশের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

ঐতরেয় অরণ্যকে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ও বোধায়ন ধর্মসূত্রে পুণ্ড্র জাতির উল্লেখ আছে এবং তাদের দস্যু রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। **মহাভারতে** দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় বিভিন্ন রাজগণের সাথে বঙ্গরাজ চন্দ্র সেন, পৌণ্ড্রক বাসুদেব ও তাম্রলিপ্তপতি উপস্থিত ছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে। ভীম পুণ্ড, বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, সুহ্ম, কর্বট প্রভৃতি রাজন্যবর্গকে পরাজিত করেছিলেন বলেও মহাভারতে উল্লেখ আছে। **জৈন আচারঙ্গ সূত্রে** উল্লেখ আছে মহাবীর রাঢ় অঞ্চলে ধর্ম প্রচার করতে এসে নিগৃহীত হয়েছিলেন। **বৌদ্ধ সাহিত্যেও** বঙ্গ, রাঢ় ও পুণ্ড্র বর্ধনের উল্লেখ আছে।

খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় দ্বিতীয় শতকে **মহাস্থান ব্রাহ্মী** লিপিতে পুণ্ড্র



ব্রাহ্মী লিপি

নগরের উল্লেখ আছে। দক্ষিণভারতের গুণ্টুর জেলার **নাগার্জুনী** কোণ্ড শিলালিপিতে বঙ্গদেশের উল্লেখ আছে। রাজা চন্দ্রের

মেহেরৌলি শিলালিপিতে প্রাচীন বঙ্গদেশের উল্লেখ রয়েছে। **দামোদরপুর** শিলালিপিতে পুণ্ড্র ভুক্তির উল্লেখ আছে। সমুদ্রগুপ্তের **এলাহাবাদ** স্তম্ভ লিপিতে জানা যায় তিনি পুষ্করণের অধিপতি চন্দ্র বর্মণকে পরাজিত করেছিলেন। এই পুষ্করণের অধিপতি প্রাচীন বাংলাদেশের জনৈক পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। ঈশান বর্মণ মৌখরীর **হড়াহা** লিপিতে গৌড় জনপদের বর্ণনা পাওয়া যায়।

গ্রাকবীর আলেজাণ্ডারের সাথে যে গ্রীক লেখকগণ ভারতে এসে-ছিলেন তাঁরা **গঙ্গারিডাই** নামে এক পরাক্রান্ত জাতির উল্লেখ করেছেন। এই গঙ্গারিডাই জাতিই যে বাংলার অধিবাসী ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। **পেরিপ্লাস গ্রন্থ ও টলেমির বিবরণেও** দেখা যায় খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে গঙ্গারিডাই পরাক্রমশালী রাজ্য ছিল। এমন কি প্রাচীন রোমের **মহাকবি ভার্জিলের** কাব্যেও গঙ্গারিডাই জাতির উল্লেখ আছে।

প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস: প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল যেমন বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল, সেইরূপ এইসব বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রাজন্যবর্গ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন। খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ শতক প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে এক গৌরবময় যুগ। গ্রীক লেখকগণের বিবরণ থেকে জানা যায়, আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় গঙ্গারিডাই জাতি মগধ থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। মগধের পরাক্রমশালী নন্দরাজগণ বাঙ্গালী ছিলেন বলে অনেকে অনুমান করেন। এই নন্দরাজগণের পরাক্রমের কথা মহাবীর আলেকজাণ্ডারকেও বিচলিত করেছিল। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের উত্তর ভাগে মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কুষাণ আমলে সম্ভবত বাংলাদেশের কিছু অংশের উপর **কুষাণ** আধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতকে পরাক্রান্ত গুপ্ত সম্রাটদের শাসনকালে বাংলার প্রায় অধিকাংশ অঞ্চলই গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। গুপ্ত সাম্রজ্যের পতনের

পর প্রাচীন বাংলার গৌড় রাজ্যকে কেন্দ্র করে **মহাসামন্ত শশাঙ্ক** খ্রীষ্টীয় ৭ম শতকে বাংলাদেশকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন।

বহির্ভারতের সাথে ভারতের যোগাযোগ

সিন্ধু সভ্যতার কাল থেকেই বাণিজ্যিক লেন-দেনের মাধ্যমে বহির্ভারতের সাথে ভারতের যোগাযোগ ছিল। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পর গ্রীস ও রোমের সাথে ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতির যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে পশ্চিম এশিয়া ও সিংহলের সাথে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। কুষাণ ও গুপ্ত সম্রাটদের আমলে মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির বিপুল প্রসার ঘটেছিল। খনন কার্যের ফলে মধ্য এশিয়ার মরু অঞ্চলে অনেকগুলি প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। এই সব নগরগুলি পরিপূর্ণভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত ছিল। মধ্যএশিয়ার **খোটান, কাসঘর, কুচা, তুরফান,** প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শনগুলি ছড়িয়ে রয়েছে। খোটানের চারদিকে অসংখ্য বৌদ্ধ স্তূপ ও দেব-দেবীর মূর্ত্তি, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় লিখিত অসংখ্য পুঁথি পত্র, অনুশাসন লিপি এবং দলিল পাওয়া গেছে। খ্রীষ্টের জন্মের কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই এ সব অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটেছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি থেকে জানা যায় ভারতীয় সংস্কৃতি এসব অঞ্চলের সমাজ জীবনকেও প্রভাবিত করেছিল। খোটানের রাজার উপাধি ছিল 'মহারায় মহারাজ দেবপুত্র'। তিনি 'মহানুভব' বিশেষণেও ভূষিত ছিলেন। প্রজাদের অনেকের নাম ছিল ভীম, বঙ্গসেন, নন্দসেন প্রভৃতি। এ সব নিঃসন্দেহে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব।

বহির্ভারতের সাথে ভারতের বাণিজ্যিক যোগাযোগ সিন্ধু সভ্যতার কাল থেকেই চলে আসছিল। প্রাচীন মেসোপটেমিয়া, মিশর

প্রভৃতি দেশের সাথে সেকালের সিন্ধু অঞ্চলের অধিবাসীদের জল ও স্থল পথে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। পরবর্তীকালে মধ্য-এশিয়ার খোটান, কাসঘর, ইয়ারখন্দ, কুচা, তুরফান প্রভৃতি অঞ্চলের মধ্য দিয়ে বিশ্ব-বাণিজ্য পথ তৈরী হয়েছিল। স্বাভাবিক ভাবেই এই পথে মধ্য-এশিয়া ও চীনের সাথে ভারতের বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও প্রভৃতি দেশের সাথেও প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল।

বৈদেশিক পর্যটকদের চোখে ভারতীয় সমাজ

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকালে গ্রীক দূত **মেগাস্থিনিস** এবং **গুপ্ত** যুগে দ্বিতীয় **চন্দ্রগুপ্তের** কালে চৈনিক পরিব্রাজক **ফা-হিয়েন** ভারত দর্শনে এসেছিলেন। এই বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ থেকে সে যুগের ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়।

মেগাস্থিনিসের বিবরণ ঃ মেগাস্থিনিসের বিবরণে দেখা যায় মৌর্যযুগে ভারতের সমাজ সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, যথা—পণ্ডিত, কৃষক, গোপালক, কারুশিল্পী, যোদ্ধা, অমাত্য ও মন্ত্রী। এ ছাড়া, সমাজে আরও নানা উপজাতি ও অন্ত্যজ বা অস্পৃশ্য জাতির উল্লেখ মেগাস্থিনিসের বিবরণে রয়েছে। বেশ বোঝা যায়, মেগাস্থিনিস ভারতীয়দের বৃত্তি অনুসারে এই শ্রেণী বিভাগ করেছিলেন। বিবরণে আরও জানা যায়, দেশে চুরি ডাকাতি ছিল না, মানুষ সুখে শান্তিতে বাস করত। সেকালে ভারতে ক্রীতদাস প্রথা ছিল, তবে তা খুব কঠোর ছিল না। সমাজে অস্পৃশ্যতা ছিল।

ফা-হিয়েনের বিবরণ ঃ বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ও বৌদ্ধ

জ্ঞান ভিক্ষু ফা-হিয়েন গুপ্ত যুগে দশ বছর ভারতের বিভিন্ন তীর্থ-স্থান ও নগর পর্যটন করে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁর বিবরণে দেখা যায়, সে যুগে দেশে চুরি ডাকাতি ছিল না, দণ্ড নীতিও খুব কঠোর ছিল না, জিনিসপত্রের দাম খুব কম ছিল। ফা-হিয়েন ভারতীয়দের আচার-আচারণ ও রুচি বোধের খুব প্রশংসা করেছেন। সেকালের জাতিভেদ প্রথা খুব কঠোর ছিল। অন্ত্যজ বা অস্পৃশ্যরা নগরের বাইরে থাকত। তারা নগরে প্রবেশ করার সময় কাঠি বাজিয়ে শব্দ করে লোকজনকে সরে যেতে বলত। পশু হত্যা কেবল নগরের বাইরে চণ্ডালরাই করত।

প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি

প্রাচীন ভারত শিল্পে, সাহিত্যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও শিক্ষা-দীক্ষায় চরম উন্নতি লাভ করেছিল। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে।

সিন্ধু সভ্যতার নগর পরিকল্পনা, অট্টালিকা ও শিল্পকর্মের নিদর্শন আমরা জেনেছি। মৌর্যযুগে সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে বহু প্রাসাদ, স্তূপ ও স্তম্ভ নির্মিত হয়েছিল। স্তম্ভ-শীর্ষে পশুমূর্ত্তি বা ধর্মচক্র শোভা পেত। সে যুগের মৌর্য শিল্পীরা পাথরের উপর পালিশের কাজে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। শিল্পীদের নির্মিত পশুমূর্ত্তিগুলির অঙ্গ-সৌষ্টব অতুলনীয়। মৌর্য যুগের পরবর্তীকালে ভরহুত, সাঁচি, বুদ্ধগয়া ও মথুরার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের অভিনব বিকাশ হয়েছিল। গান্ধার ও মথুরায় গ্রীক ও রোমান শিল্পরীতির সংমিশ্রণে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অভাবনীয় উন্নতি হয়েছিল। প্রাচীন-ভারত স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে চরম উৎকর্ষতা অর্জন করেছিল গুপ্ত যুগে। সারনাথ, অজন্তা, ইলোরা, বাগ প্রভৃতি স্থানের স্থাপত্য,

ভাস্কর্য ও চিত্র শিল্পের মহিমা আজও সকলকে অভিভূত করে। অজন্তাগুহার শ্রেষ্ঠ গুহা চিত্রগুলি গুপ্ত যুগেই অঙ্কিত হয়েছিল।



অজন্তার গুহাচিত্র

প্রাচীন ভারতের সাহিত্য সাধনার গৌরবময় নিদর্শন রয়েছে বৈদিক সাহিত্যে, রামায়ণে ও মহাভারতে। এ ছাড়াও অসংখ্য শাস্ত্র, পুরাণ প্রভৃতির বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার ভারতীয় ঐত্যহ্যকে মহিমামণ্ডিত করেছে। মৌর্য এবং মৌর্যোত্তর যুগের অধিকাংশ গ্রন্থই রচিত হয়েছিল সংস্কৃত ও পালি ভাষায়। কৌটিল্যের **অর্থশাস্ত্র**, পাতঞ্জলির **মহাভাষ্য**, নাগার্জুনের **মাধ্যমিক সূত্র**, অশ্বঘোষের **বুদ্ধ চরিত**, চরক ও সুশ্রুতের **আয়ুর্বেদ গ্রন্থ**, মৌর্য ও মৌর্যোত্তর যুগের বিরাট কীর্তি। সাহিত্যক্ষেত্রে গুপ্ত যুগই সবচেয়ে বেশী গৌরবমণ্ডিত। এ যুগেই সংস্কৃত সাহিত্যের চরম বিকাশ ঘটে। **মহাকবি কালিদাস** এই যুগেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর রচিত **শকুন্তলা**, **মেঘদূত** **রঘুবংশ**, **কুমার সম্ভব** প্রভৃতি বিশ্বসাহিত্যের অমর সৃষ্টি। এছাড়া হরিষেণের **এলাহাবাদ প্রশস্তি**, শূদ্রকের **মৃচ্ছকটিক**, বিশাখাদত্তের **মুদ্রারাক্ষস** প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

দর্শন ও বিজ্ঞানে প্রাচীন ভারত বিস্ময় কর কীর্তি স্থাপন করেছে। বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্র, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন, আয়ুর্বেদশাস্ত্র প্রভৃতি সকল বিষয়েই সেকালে ভারত অগ্রণী ছিল। ১ থেকে ৯ পর্যন্ত গণনা, '0' শূন্যের আবিষ্কার ও বীজগণিতের সূত্র ব্যবহার সে কালে ভারতীয়গণই প্রথম করেন। জ্যোতির্বিদ্যায় আর্যভট্ট ও বরাহ মিহিরের নাম উল্লেখযোগ্য। চরক এবং সুশ্রুত ছিলেন আয়ুর্বেদশাস্ত্রে মস্ত পণ্ডিত।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে গুপ্ত যুগ ছিল স্বুবর্ণ যুগ।

শিক্ষা কেন্দ্র ঃ প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানে যে অভাবনীয় উন্নতি হয়েছিল তাতে সেকালের দুইটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষাকেন্দ্র **তক্ষশিলা** এবং **নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের** যথেষ্ট অবদান ছিল।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের গান্ধার রাজ্যে তক্ষশিলা সুপ্রাচীনকাল থেকেই প্রসিদ্ধ বিদ্যায়তন হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিল। প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ্য শল্য চিকিৎসক জীবক ছিলেন এই তক্ষশিলার ছাত্র। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে হুন আক্রমণে তক্ষশিলা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

পূর্ব ভারতের বিহারে নালন্দা ছিল সে যুগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা কেন্দ্র। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেকালের রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় সহস্র সহস্র ছাত্র অধ্যয়ন করত এবং অগণিত শিক্ষক সেখানে অধ্যাপনা করতেন। ধর্মশাস্ত্র, দর্শন ও বিজ্ঞানের বহু বিষয় এখানে পড়ান হত। পরবর্তীকালে মুসলমান আক্রমণে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

অনুশীলনী

১। **বিষয়মুখী ও মৌখিক প্রশ্ন ঃ**

(ক) আর্যরা কবে ভারতে আসে? (খ) আর্যদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল? (গ) আর্যরা ভারতের কোথায় প্রথম বসতি স্থাপন করে?

(ঘ) আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য কাকে বলে? (ঙ) বেদ কি? উহা কয় প্রকার ও কি কি? (চ) বেদের অপর নাম কি? (ছ) রামায়ণ ও মহাভারত কি? উহা কে রচনা করেন? (জ) জৈন ধর্ম কে প্রবর্তন করেন? (ঝ) বৌদ্ধ ধর্ম কে প্রবর্ত্তন করেন? (ঞ) জৈন ধর্মগ্রন্থের নাম কি? (ট) বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থের নাম কি? (ঠ) বোধিক্রম কি? (ড) মহা জনপদ কি? (ঢ) খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতকের কয়েকটি মহা জনপদের নাম কর। (ণ) কোন্ মহা জনপদ সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল? (ত) মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? (থ) চন্দ্রগুপ্তের আমলে কোন্ বিদেশী পর্যটক ভারতে আসেন? (দ) অমিত্রাঘাত উপাধি কে গ্রহণ করেছিলেন? (ধ) কুষাণ কাদের বলা হয়? (ন) শকাব্দ কে প্রবর্তন করেন? (প) কণিষ্কের রাজধানী কোথায় ছিল? (ফ) গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কে ছিলেন? (ব) এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? (ভ) হরিষেণ কে ছিলেন? (ম) বিক্রমাদিত্য ও শকারি উপাধি কে গ্রহণ করেছিলেন? (য) কোন্ বিদেশী পর্যটক গুপ্ত যুগে ভারত দর্শনে এসেছিলেন? (র) কাদের আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল? (ল) গঙ্গারিডাই জাতি কাদের বলা হত? (ব) কোন্ যুগকে ভারতীয় সংস্কৃতির স্বর্ণ যুগ বলা হয়। (শ) কালিদাস কে ছিলেন? (ষ) প্রাচীন ভারতের দুইটি শিক্ষা কেন্দ্রের নাম কর।

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন

(ক) আর্যদের পরিচয় দাও। (খ) বৈদিক সাহিত্য বলতে কি বোঝায়? (গ) বৈদিক যুগের শ্রেণী বিন্যাস কিরূপ ছিল? (ঘ) চতুরাশ্রম কি? (ঙ) বৈদিক যুগের ধর্ম কিরূপ ছিল? (চ) বৈদিক যুগে নারীর স্থান কিরূপ ছিল? (ছ) মহাকাব্যে কি শিক্ষনীয় বিষয় আছে? (জ) জৈন ধর্মে মোট কতজন তীর্থঙ্কর ছিলেন? (ঝ) চতুর্যাম কি? (ঞ) জৈন ধর্মের গ্রন্থগুলি কি? (ট) গৌতম বুদ্ধের বাল্যজীবন সম্বন্ধে কি জান? (ঠ) অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি? (ড) ষোড়শ মহাজনপদ বলতে কি বুঝ? কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মহাজনপদের নাম কর। (ঢ) চন্দ্রগুপ্তের বংশের নাম মৌর্য বংশ হল কেন? (ণ) চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল? (ত) কলিঙ্গ যুদ্ধ অশোকের জীবনে কি পরিবর্তন এনেছিল? (থ) অশোক প্রজাসাধারণের কল্যাণের জন্য কি করেছিলেন? (দ) কণিষ্কের রাজত্বকালের গুরুত্ব কি? (ধ) সমুদ্র-গুপ্তের দক্ষিণ ভারত জয়ের নীতি কিরূপ ছিল? (ন) বিক্রমাদিত্যের সাম্রাজ্য

সীমা কতদূর বিস্তৃত ছিল? (প) গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন হয় কি ভাবে? (ফ) প্রাচীন বাংলা কি কি নামে পরিচিত ছিল? (ব) কোন্ কোন্ প্রাচীন গ্রন্থে বাংলার উল্লেখ আছে? (ভ) কোন্ কোন্ লিপিতে প্রাচীন বাংলার উল্লেখ আছে? (ম) গ্রীক লেখকগণ প্রাচীন বাংলাকে কি ভাবে বর্ণনা করেছেন? (য) মধ্য-এশিয়ার কোন্ কোন্ অঞ্চলে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া গেছে?

৩। **রচনা ভিত্তিক প্রশ্ন:**

(ক) বৈদিক যুগের আর্যদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন আলোচনা কর। (খ) বেদ ও ব্রাহ্মণ বিরোধী আন্দোলন দেখা দিল কেন? এই আন্দোলনের ফল কি হল? (গ) মহাবীরের জীবনী ও তাঁর ধর্মমত আলোচনা কর। (ঘ) গৌতম বুদ্ধের জীবনী ও তাঁর ধর্মমত আলোচনা কর। (ঙ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকালের বিবরণ দাও। (চ) অশোকের শ্রেষ্ঠত্বের বিবরণ দাও। (ছ) কণিষ্কের রাজত্বকালের বিবরণ দাও। (জ) সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালের বিবরণ দাও। (ঝ) প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস লেখ। (ঞ) মধ্য এশিয়ার প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির কি পরিচয় পাওয়া যায়? (ট) প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক বিকাশের পরিচয় দাও। (ঠ) গুপ্ত যুগকে স্বর্ণ যুগ বলা হয় কেন? (ড) প্রাচীন ভারতের দুইটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষা কেন্দ্র বিষয়ে কি জান?

উল্লেখযোগ্য ঘটনার কাল

খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ঃ

৫০০০০০	…	মানুষের আবির্ভাব।
৩০০০০০	…	মানুষ আগুনের ব্যবহার শিখেছিল।
৮০০০	…	নব প্রস্তর যুগের সূচনা, কৃষির আবিষ্কার।
৩০০০	…	ধাতুযুগ ও নদীমাতৃক সভ্যতার বিকাশ। (মেসোপটেমিয়া, মিশর, সিন্ধু অঞ্চল, ইয়াং-সি-কিয়াং ও হোয়াং-হো অঞ্চলের সভ্যতা)।
১৭৯২	…	হামুরাবির শাসন।
১৫০০	…	লৌহযুগের সূচনা, আর্যদের ভারত আগমন।
৭৫৩	…	রোম নগরীর পত্তন।
৫৬৬	…	গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব।
৫৫১	…	কনফুসিয়াসের আবির্ভাব।
৫৪০	…	মহাবীরের আবির্ভাব।
৪৪৩	…	পেরিক্লিসের আবির্ভাব।
৪৩১	…	পেলোপনেসিয়ান যুদ্ধ।
৩২৭	…	আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ।
৩১৪	…	চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সিংহাসন আরোহণ।
২৭৩	…	অশোকের সিংহাসন আরোহণ।
২৬৪—৬১	…	পিউনিক যুদ্ধ।
২২১	…	শি-হুয়াং-তির চীনের সম্রাট পদে আসীন।
৭৩	…	স্পার্টাকাসের বিদ্রোহ।
৪৪	…	সীজার হত্যা।
৩০	…	অগাষ্টাসের সম্রাট পদে আসীন।
৭৮	…	কণিষ্কের সিংহাসন আরোহণ।
৩৩০	…	সমুদ্রগুপ্তের সিংহাসন আরোহণ।
৪৭৬	…	রোম সাম্রাজ্যের পতন।
৫৩৫	…	গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন।